সুড়ঙ্গ রহস্য
শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ

সুড়ঙ্গ রহস্য

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ট্রেনটা লক্ষ্ণৌ স্টেশন থেকে ঘুরে উত্তরমুখো চলতে শুরু করার পর থেকেই ওদের শীত শীত করছিলো। বেলা যতো বেড়েছে ঠাণ্ডাটাও যেন ততোই জাঁকিয়ে বসেছে। [illegible] থেকে তো রীতিমতো কাঁপুনি।

ওরা ভাবতেও পারেনি, এদিকে এই মার্চ মাসেও এতো ঠাণ্ডা। কলকাতায় ওরা যখন জম্মু-তাওয়াই এক্সপ্রেসে চড়েছিলো তখন রাস্তার পিচ গলছে। এই সময় অবশ্য অতো শীত পড়ে না। তবু ওরা বুদ্ধি করে সোয়েটার নিয়েছিলো। মামু জোর করায় মিউ একটা চাদরও নিয়েছে। এখন সেই চাদর জড়িয়েও শীত কাটছে না। ট্রেনের জানলাগুলো সব বন্ধ, তাতেই এই; ট্রেন থেকে নামলে কী হবে কে জানে!

বসু ঘড়ি দেখে বললো, এখন সাতটা বাজে আর ঘণ্টা দেড়েক পরে আমরা নামবো।

নামার কথায় আমার ভয় করছে বাবুলদা।

রাজা বললো, আমি তোদের বলেছিলাম বেশি করে গরম জামা-কাপড় নে। আমার কথা শুনলি না।

মিউ-এর কোলে ঝিকি চুপটি করে বসে আছে। সোমা তার পাশে। বুয়া বসে বসে ঝিমোচ্ছে। ওর অতো শীত করে না। মিউ বললো, আম্বু আর পিয়ারও খুব আসার ইচ্ছে ছিলো। ভাগ্যিস আসেনি। যা শীতকাতুরে!

ট্রেনটা হু-হু করে ছুটছে। চাঁদের আলোয় অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। দূরে পাহাড়ের সারি আবছা চোখে পড়ে। ট্রেনে চড়লে ওরা বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। ভীষণ ভালো লাগে চলন্ত ট্রেন থেকে বাইরের দৃশ্য দেখতে। আজ আর ওসব ভালো লাগছে না। সত্যিই তো এইরকম শীত করলে কি কিছু ভালো লাগে?

একটু পরেই কনডাক্টার গার্ড এসে বললেন, তোমরা তৈরি হয়ে নাও। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই রুড়কি স্টেশনে গাড়ি থামবে।

তুমি বুঝি বলে রেখেছিলে বাবুদাদা? সোমা জিজ্ঞেস করলো।

আমি ঠিক চিনতে পারতাম। কতোবার এসেছি। রাজা বললো।

বুয়া আগেই সব রেডি করে রেখেছিলো। ওরা ধরাধরি করে ওদের বেডিং আর স্যুটকেসগুলো ট্রেনের দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে রাখলো। ট্রেন তো এখানে বেশিক্ষণ থামবে না। ততোক্ষণে ট্রেনের স্পিড কমে এসেছে। বাবু দরজাটা খুলতেই হিমেল হাওয়ার ঝাপটা এসে লাগলো ওদের চোখে-মুখে।

উঃ, কী ঠাণ্ডা রে! একদম জমে যাবো।

আমি স্টেশনে নেমে খানিকটা ছুটোছুটি করে নেবো।

ধ্যাৎ। তাতে কি আর শীত কমে! বাবু আর রাজার কথা শুনে বুয়া বলে উঠলো।

ট্রেনটা ততোক্ষণে প্লাটফর্মে ঢুকে পড়েছে। ট্রেন থামতেই বাবু লাফিয়ে নেমে পড়ে চটপট জিনিসগুলো নামিয়ে নিলো। ততোক্ষণে মিঊ, সোমা আর বুয়া নেমে পড়েছে। সবার শেষে নেমে রাজা লাফাতে লাগলো। বাবু শ্যাডো স্কিপিং করছে। হঠাৎ দেখা গেলো প্রত্যেকের গায়ে একটা করে চাদর এসে পড়ছে। অবাক হয়ে তাকাতেই মিঊ দেখলো সামনে দাঁড়িয়ে হাসছেন মামণি আর জেঠু। মিঊ অবশ্য জেঠুকে

মেজদা বলে ডাকে। মামণি বললেন, রাজা, তুই তো জানতিস এখানে এখনো কতোটা ঠাণ্ডা থাকে!

মেজদা বললেন, আমি তোমায় বলেছিলাম না ওরা ঠিক একটা করে সোয়েটার নিয়ে আসবে।

কথা বলতে বলতে ওরা গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলো। গাড়ির কাচ-টাচ তুলে বসতেই কিকি বলে উঠলো, বাঁচলাম!

গাড়িটা স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসে বাঁক নিয়ে খালধার দিয়ে ছুটতে লাগলো গাছ-গাছালির মধ্যে দিয়ে। চাঁদের আলোয় তেমন ভালোভাবে দেখা না গেলেও ওরা খালের জলে চাঁদের প্রতিফলন দেখতে পেলো। দেখতে পেলো সামনের পিচ বাঁধানো রাস্তাটা গাছ-গাছালির মধ্যে দিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। গাড়ির মধ্যে ততোটা শীত করছিলো না। মেজদা কলকাতা আর টাকীর বাড়ির সকলের খোঁজখবর নিচ্ছিলেন।

গাড়িটা কখন যে ক্যান্টনমে ট ঢুকে বাংলোর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা বুঝতেও পারেনি। গাড়ি থেকে নেমে ওরা চটপট বাড়ির মধ্যে চলে গেলো। অর্ডারলিরা এগিয়ে এসেছে। তারাই ওদের জিনিসপত্তর বাড়ির মধ্যে নিয়ে যাবে।

গরম জলে মুখ-টুখ ধুয়ে বনমুরগির ঝোল দিয়ে গরম গরম ভাত খেয়ে ওরা তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লো। এখন আর শীতে ততোটা কষ্ট হচ্ছে না। কিকির খাবারও তৈরি ছিলো। বুয়া কিকিকে খাইয়ে দিলো। কিকি এসে মিউ-এর মাথার কাছে আলমারির ওপর বসে গম্ভীর গলায় বললো, ঘুমিয়ে পড়ো সকলে। কাল সকালে পড়তে বসতে হবে!

থাম তো! এখানে এসেও পড়বো নাকি আমরা?

মোমার কথায় সকলে হেসে উঠলো। সকলকে হাসতে দেখে কিকি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললো, মামকে বলে দেবো কিন্তু!

মামকে কোথায় পাবি! বল মামণিকে বলে দেবো।

মা-মণি...মা-মণি—কিকি নিজের মনে দুবার প্র্যাকটিশ করে নিয়ে চোখ বুজলো। কাল রাত্তিরে ট্রেনে ওদেরও ভালো ঘুম হয়নি। ওরাও এক এক করে ঘুমিয়ে পড়লো। একটু পরেই গার্ডরুম থেকে ঢং ঢং করে এগারোটা বাজার ঘণ্টা বাজলো। ওরা তা শুনতেও পেলো না। পরদিন সকালে মামণি এসে জানলার মোটা পর্দা সরিয়ে দিতেই একরাশ আলো এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো ঘরে। এক এক করে চোখ মেললো ওরা। বেশ শীত। উঠতেই ইচ্ছে করছে না। মামণি তাড়া দিলেন, ওঠ, ওঠ—বাইরেটা কি সুন্দর, যা খানিকটা ঘুরে আয়। সোয়েটার পরো চাদর জড়িয়ে বেরুবি। বাইরে খুব ঠাণ্ডা। কাল টেম্পারেচার কতোয় নেমেছিলো জানিস?

কতোয়?

দুই...দুই ডিগ্রি। কলকাতায় তো নয়-দশের নিচে নামেই না।

এখানে কি এখনো এইরকম ঠাণ্ডা থাকে? বাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

নারে। ক'দিন ঝড়-বৃষ্টি হয়েছে। মুসৌরিতে বরফ পড়েছে, তাই। দু-চার দিনের মধ্যেই কমে যাবে।

ওরা মুখ-টুখ ধুয়েই বেরিয়ে পড়লো। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। হাঁটলে কষ্ট হয় না। কিকি বাগানে একটা গাছের ওপর বসেছিলো। উড়ে এসে মিউ-এর কাঁধে বসলো। ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে ওরা হাঁটতে হাঁটতে খালের ধারে এলো। খালটা সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। জল টলমল করছে। অনেক দূরে খালের ওপর সেতু। তার ওপর দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে। দূরে পাহাড়ের সারি। খালের ধার দিয়ে রাস্তা। ওরা হাঁটতে লাগলো সেতু লক্ষ্য করে। কাঁচা হলুদের মতো সকালের রোদ এসে পড়েছে ওদের গায়। ও রোদে গা তাতে না, কিন্তু আরাম হয়। বাতাস নেই। তাই ওদের হাঁটতে খুব ভালো লাগছে।

বাসস্ট্যান্ড পেরিয়ে, পোলারিস হোটেল পেছনে ফেলে ওরা হাঁটছিলো। রাস্তায় তেমন ভিড় নেই। এতোক্ষণে মাত্র একটা বাস হরিদ্বারের দিকে গেছে। দু-চারটে গাড়ি ছুটে যাচ্ছে, রিকশা, সাইকেল, টাঙাও আছে। দূরে সিনেমা হল থেকে মাইকে হিন্দি গান ভেসে আসছে। রাজা হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো, ঐ দ্যাখ সিংহদাদু।

ওরা দেখলো একটু আগে একটা বাড়ির গেটের কাছে এক বয়স্ক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। টকটক করছে ফর্সা রং। লম্বা, পাতলা চেহারা। রাজা বললো, রুড়কি ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভারসিটির প্রফেসর। জানিস শান্তিনিকেতনের সব জমি একসময় ওঁদের ছিলো।

কথা বলতে বলতে ওরা অনেকটা এগিয়ে এসেছিলো। সিংহমশাই-এর কাছে আসতেই তিনি বলে উঠলেন, এই যে রাজাবাবু, ভাইবোনদের নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছো? এসো, এসো...

রাজা সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো। সিংহমশাই বললেন, জানি, জানি, তোমরা তো ফেমাস! কিকিকেও চিনি। তা এখানে কি কোনো রহস্যের সন্ধানে, না...

মিউ বললো, না, না, আমরা বেড়াতে এসেছি। এখন যাচ্ছি ঐ যে খালের তলা দিয়ে নদী যাচ্ছে তাই দেখতে।

খালের তলা দিয়ে নদী? মোমা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

সিংহমশাই হাসলেন। বললেন, খালের তলা দিয়ে নদী যাচ্ছে শুনেই অবাক হয়ে যাচ্ছো দিদি—এই খাল ধরে হরিদ্বারের দিকে এগিয়ে গেলে এক জায়গায় দেখতে পাবে একটা নদী যাচ্ছে খালের ওপর দিয়ে।

সেকি!

হ্যাঁ! শুনবে সে গল্প?

হ্যাঁ, শুনবো। ওরা একসঙ্গে বলে উঠলো।

তাহলে এসো।

ওরা সিংহমশাই-এর পেছনে পেছনে গিয়ে ঢুকলো ওঁদের বসার ঘরে। সোফা-ডিভান দিয়ে ঘরটা সাজানো। দেওয়ালে হিমালয়ের স্নো রেঞ্জের একটা বিরাট ছবি। তুষারশৃঙ্গগুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। ওপাশে রবীন্দ্রনাথের আঁকা একতারা হাতে বাউলের ছবি।

সিংহমশাই বাড়ির সকলের সঙ্গে ওদের আলাপ করিয়ে দিলেন। ওদের নাম শুনে সকলে হৈ হৈ করে উঠলেন। কেল্লা রহস্য আর ভাঙাবাড়ির রহস্য বই দুটো যে ওঁদের বাড়িতেও আছে। সিংহমশাই-এর কুকুর জিমির সঙ্গে মিউ-এর খুব ভাব হয়ে গেলো। জিমি পাহাড়ী কুকুর। বিশাল চেহারা। দেখলে ভয় করে। কিকির সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে ভাব হয়ে গেলো। কিকি জিমির পিঠে চড়ে বসলো। তারপর দুজনে চলে গেলো বাগানে। একটু পরেই ওদের

জন্যে গরম গরম সিঙ্গাড়া আর কোকো এসে গেলো। কোকো ওদের একদম ভালো লাগে না। উপায় নেই। খেতেই হবে।

এবার তাহলে গল্পটা বলুন।

গল্প নয়, সত্যি। তোমরা খাও, আমি বলছি।

সিংহমশাই চুপ করলেন। কিভাবে শুরু করবেন ঠিক করে নিয়ে বলতে শুরু করলেন:

রুড়কি কিন্তু খুবই পুরনো শহর। আইন-ই-আকবরিতে রুড়কি নামে একটি পরগনার কথা আছে। আগে এটি একটি ছোট্ট গ্রাম ছিলো। সোলানি নদীর ধারে এই গ্রাম। নদী নিচে দিয়ে যাচ্ছে। গ্রামটা একটু উঁচুতে। আর এই যে আমরা যেদিকটায় আছি, এদিকটাকে নতুন শহর বলে। যদিও এর বয়েস একশ বছর কবেই পার হয়ে গেছে। খালের ওপারটা পুরনো রুড়কি। নতুন শহরটার বেশির ভাগই দেখবে সুন্দর পাথর আর খাল কাটার মাটির ওপর গড়ে উঠেছে।

সেই ১৮৩৭-৩৮ সালে এই অঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। বহু মানুষ মারা গিয়েছিলো। চারপাশে এতো জমি। কিন্তু জলের অভাবে চাষ হয় না। অথচ হরিদ্বারে গঙ্গায় অনেক জল। সারা বছরই থাকে। সেই জল যদি কোনোভাবে এদিকে আনা যেতো তাহলে চাষের খুব সুবিধে হতো। তা ঐ দুর্ভিক্ষের ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির টনক নড়লো। এর আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৮২২ সাল নাগাদ একটা খাল কাটার চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা তা পারেনি। ঐ দুর্ভিক্ষের পর কর্নেল কট্‌লের ওপর ভার দেওয়া হলো। তিনি অনেক ঘোরাঘুরি করলেন। গবেষণা করলেন। কিন্তু তারপর সব ধামাচাপা পড়ে গেলো। কিন্তু ঐ দুর্ভিক্ষের পর আবার বিষয়টা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু হলো। তখন ভারতের বড়লাট লর্ড অকল্যান্ড। কলকাতার রাজভবনে তাঁর কাছে গঙ্গার খাল কাটার প্রস্তাবটা এলো। তিনি হিসেব করে দেখলেন হরিদ্বার থেকে কানপুর পর্যন্ত খাল কাটতে পারলে উত্তর প্রদেশের তিরিশ লক্ষ বিঘার ওপর জমি কৃষির উপযোগী হয়ে উঠবে। বড়লাট প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তাবটা মঞ্জুর করে দিলেন। খাল কাটার সব দায়িত্ব দেওয়া হলো কর্নেল কট্‌লে সাহেবের ওপর।

ব্যাপারটা তো আর এক-আধ মাইলের নয়—হরিদ্বার থেকে কানপুর—দীর্ঘ ৪০০ মাইল খাল কাটতে হবে। তবে তার চেয়েও বড় অসুবিধে ছিলো অন্য জায়গায়।

খাল কাটার দায়িত্ব নিয়ে কট্‌লে সাহেব চলে গেলেন। হরিদ্বারের কাছে গঙ্গা দুটো ধারায় বয়ে যাচ্ছে, পশ্চিম ধারাটা ব্রহ্মকুণ্ড, মায়াপুর আর কনখলের পাশ দিয়ে আর নীল ধারাটি চণ্ডী পর্বতের তলা দিয়ে চলে গেছে। কট্‌লে সাহেব প্রথম ধারা থেকে খাল কাটার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং কাজ আরম্ভ করলেন। কিন্তু কাজ আরম্ভ করার পরই কট্‌লে সাহেবের মাথায় হাত।

কেন, কেন? ওরা একসঙ্গে জিজ্ঞেস করে উঠলো।

কট্‌লে সাহেব দেখলেন, হরিদ্বার থেকে রুড়কি পর্যন্ত এমনই প্রাকৃতিক বাধা যে খাল কাটা অসম্ভব। হরিদ্বার থেকে রুড়কির দিকে আসতে গেলে রানীপুর আর পাথরিতে দুটি পাহাড়ী নদী পার হতে হয়। কট্‌লে সাহেব সুড়ঙ্গ খুঁড়ে খাল তার মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাবেন বলে ঠিক করলেন। কিন্তু তাঁর কাজের সামনে সব থেকে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ালো রুড়কির সোলানি নদী। পাহাড়ী নদী হলে কি হবে, সোলানি রীতিমতো প্রশস্ত। এই বাধাটা ডিঙোতে পারলে তবেই মোটামুটি সমতল ভূমির ওপর দিয়ে তিনি খালটা কেটে নিয়ে যেতে পারবেন।

নদীর সঙ্গে খালটা মিশলে অসুবিধেটা কি?

সিংহদাদু হাসলেন। বললেন, হরিদ্বার থেকে যে জল আনা হবে তা যে এদিক ওদিকে চলে যাবে। হরিদ্বার থেকে কানপুর ৪০০ মাইল। কট্‌লে সাহেব এতোটা পথ জল টেনে নিয়ে যেতে চান। তাই অনেক ভেবেচিন্তে সোলানি নদীর ওপর দিয়ে খালটা নিয়ে যাবেন বলে ঠিক করলেন। আর তাই শুনে লোকে হাসাহাসি শুরু করলেন। সকলে ধরে নিলেন, এ এক অসম্ভব ব্যাপার। একটা কথা মনে রাখতে হবে, তখনো কিন্তু সিমেন্ট আবিষ্কার হয়নি। চুন, বালি আর সুরকি দিয়েই জলসেতু তৈরি করতে হবে।

কাট্‌লে সাহেব তো কাজ শুরু করলেন। তোমরা রুড়কি ব্রিজের ওপর উঠলে ডান দিকে একটা কারখানা দেখতে পাবে। খালের কাজের জন্যেই কারখানাটা শুরু করেছিলেন কাট্‌লে সাহেব।

তারপর কি হলো? মিউ ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

কাজ শুরু করার কিছুদিন পরেই কাট্‌লে সাহেব মস্ত ধাক্কা খেলেন। সোলানি নদীর ওপর যে জলসেতু তৈরি করছিলেন সেটা হঠাৎ ভেঙে পড়লো। সেতু ভাঙলেও কাট্‌লে সাহেবের মন কিন্তু ভাঙলো না। আসলে তিনি ধর্ম মেনে চলতেন। গঙ্গা যে পবিত্র নদী তা তিনি জানতেন। তিনি এদেশের সাধুসন্তদেরও মেনে চলতেন। তিনি হরিদ্বারে গিয়ে সাধুদের সঙ্গে দেখা করে তাঁর সঙ্কল্পের কথা বলে তাঁদের আশীর্বাদ চাইলেন। লক্ষ লক্ষ মানুষের উপকার হবে শুনে সাধুরা তাঁকে রোজ গঙ্গাস্নান ও ভস্মধারণ করতে বললেন। কাট্‌লে সাহেব তাই করতে লাগলেন। কাজও চলতে লাগলো পুরোদমে। রানীপুর আর পাথরিতে সুড়ঙ্গ তৈরি হয়ে গেলো। সোলানি নদীর ওপর জলসেতুও দেখতে দেখতে শেষ হয়ে এলো। অনেকগুলি পিলারের ওপর অর্ধডিম্বাকৃতি সেতুটা দ্বিতীয়বার তৈরি হয়ে গেলো।

জলসেতুর ওপর দিয়ে জল যাবে একথা কেউ বিশ্বাস করলেন না। সকলেই ধরে নিলেন হরিদ্বার থেকে জল এসে সেতুর ওপর পড়লেই সেই ভারে সেতুটা হুড়মুড় করে সোলানি নদীতে ভেঙে পড়বে। কাট্‌লে সাহেবের কানেও কথাটা গিয়েছিলো। তিনি ভগীরথের গঙ্গাকে মর্ত্যে আনার কাহিনী বারবার পড়েছিলেন। তিনি ঠিক করলেন, জলসেতু যদি ভেঙে পড়ে তাহলে তিনিও প্রাণ বিসর্জন দেবেন।

জলসেতু তৈরি হয়ে যাবার পর জল ছাড়ার দিন ঠিক হলো। কাট্‌লে সাহেব সেদিন সকালবেলায় হরিদ্বারে গঙ্গাস্নান করে মাথায় সোনার টোপরের মতো মুকুট পরে ঘোড়ায় চড়ে রুড়কির দিকে যাত্রা করলেন। তাঁর হাতে শাঁখ। ভগীরথের মতো তিনিও আগে আগে চলেছেন। শাঁখ বাজাচ্ছেন মাঝে মাঝে। সোলানি নদীর কাছাকাছি এসে জলসেতুর পাশের রাস্তায় ঘোড়ার ওপর বসে রইলেন তিনি। জলের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও সেতুর ওপর উঠবেন। সেতু ভেঙে পড়লে তিনি একই সঙ্গে নিচে পড়ে প্রাণ দেবেন—এই তাঁর প্রতিজ্ঞা।

আশেপাশের গাঁ ভেঙে লোক এসেছে নদীর ওপর দিয়ে খাল নিয়ে যাবার সেই অসম্ভব কাণ্ড দেখতে। এর আগের বার সেতু ভেঙে পড়ায় সকলেরই মনে সন্দেহ। আশা-নিরাশায় দুলছে সকলের মন। ওদিকে কাট্‌লে সাহেব হরিদ্বারের দিকে মুখ করে বসে আছেন। তাঁর দৃষ্টি দূরে। জল আসছে কিনা দেখছেন তিনি।

হঠাৎ তাঁর চোখে পড়লো উদ্দাম জলরাশি প্রচণ্ড বেগে আসছে। ঘুরে গিয়ে শাঁখ বাজাতে বাজাতে জলসেতুর দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন কাট্‌লে সাহেব। জলের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি উঠলেন সেতুর ওপর। জল তাঁর পাশ দিয়ে হু-হু করে নদী পার হয়ে চলে গেলো। সেতু যেমন ছিলো তেমনই রইলো। এতোক্ষণ যাঁরা নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করছিলেন তাঁরা জয়ধ্বনি করে উঠলেন। হাসি ফুটলো কাট্‌লে সাহেবের মুখে।

সিংহদাদু চুপ করলেন। ওরা এতোক্ষণ চুপ করে ছিলো। বাবু বললো, চল্ চল্ আমরা এক্ষুণি গিয়ে কাট্‌লে সাহেবের জলসেতু দেখে আসি।

ওরা উঠে দাঁড়ালো। সিংহদাদু বললেন, জলসেতুর অনেক আগেই তোমরা রুড়কি ব্রিজ পার হবে পুরনো রুড়কির দিকে যেতে। ঐ সেতুর ওপর চারটে সিংহের মূর্তি আছে দেখে নিও।

কথা বলতে বলতে ওরা বাইরে এসে দাঁড়ালো। জিমিও এসে দাঁড়িয়েছে। জিমি যে ওদের সঙ্গে যেতে চাইছে, মিউ তা বুঝতে পেরে সিংহদাদুকে বললো, জিমি যাবে আমাদের সঙ্গে। একটু পরেই ফিরে আসবো। ওকে দিয়ে যাবো।

সিংহদাদু হাসলেন। বললেন, ও তোমাদের পেয়েছে। আর কি বাড়ি থাকে! নিয়ে যাও। বুঝতে পারছি, এখন ক'দিন ও তোমাদের সঙ্গেই থাকবে। বাড়িতে আর ওর মন টিকবে না।

সিংহদাদুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে ওরা এগিয়ে চললো ব্রিজের দিকে। বেলা বাড়লেও রোদের তেজ চড়েনি। রোদ মেখে হাঁটতে ভালোই লাগে। পাঁচটি ছেলেমেয়ে, একটা বাঘের মতো কুকুর আর কাকাতুয়া দেখে সকলে ওদের দিকে তাকাতে লাগলো। আরও একটু এগিয়ে সিনেমা হলটা ডান দিকে রেখে ওরা এসে খালের ব্রিজটার ওপর উঠে এলো। সিংহের বিরাট মূর্তির পাশ দিয়ে এসে ওরা হরিদ্বারের দিকে তাকাতেই সে খানি নদীর ওপর কাট্‌লে সাহেবের জলসেতুটা পরিষ্কার দেখতে পেলো।

মোমা বললো, মিউ, দ্যাখ দ্যাখ...

কী?

ঐ যে!

দূরে হিমালয়ের পাহাড়গুলোর ওপর দিয়ে কয়েকটা তুষারশৃঙ্গ সোনালি রোদে ঝলমল করছে। চোখ ফেরানো যায় না এতো সুন্দর। নিচে খালের জল কলকল করে কানপুরের দিকে চলেছে। নীল আকাশের ছায়া জলের ওপর। তার কিছু দূরে তুষারশৃঙ্গ আর বন-জঙ্গলে ঘেরা পাহাড়। ওরা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো সেইদিকে।

মিউ বললো, চল্ এবার ফিরে যাই। আর দেরি করলে মামণি রাগ করবেন।

জিমিকে সিংহদাদুর বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ওরা চললো ক্যান্টনমেন্টের দিকে।

॥ দুই ॥

দুপুরবেলায় খেয়ে-দেয়ে উঠে ওরা গল্প করছিলো। হঠাৎ বাইরে কিকি চেঁচিয়ে উঠলো। মিউ বললো, কে আসছে—কিকি এতো খুশি?

ওরা বাইরে গিয়ে দাঁড়াতেই জিমি লেজ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে এলো। মিউ অবাক হয়ে বললো, জিমি, তুই কি করে চিনে এলি?

মামণিও বাইরে এসেছিলেন, ও তো এ-বাড়ি চেনে। অনেকবার এসেছে। রাজাকে তোদের সঙ্গে দেখেছে তো! ও তাই ঠিক বুঝতে পেরেছে।

তিনটে বাজে, বাবা এখনো এলেন না যে! রাজা মামণিকে জিজ্ঞেস করলো।

দেরি হবে। ফোন করেছিলেন।

এতো দেরি তো হয় না!

কি জানি কী ব্যাপার!

আমরা একটু ঘুরে আসব? বাবু জিজ্ঞেস

করলো।

যা না।

মামণির অনুমতি পেয়ে ওরা ক্যান্টনমেন্টের বাইরের দিকে পা বাড়ালো। জিমি চললো আগে আগে। তার পিঠে কিকি।

রাজা বললো, ওদিকে না গিয়ে আমরা বরং ফায়ারিং রেঞ্জটা দেখে আসি।

বাবু লাফিয়ে উঠলো, কোন দিকে রে?

এই তো কাছেই। সেনানিবাসের ওপাশটায়।

ওরা হাঁটতে লাগলো। বড় বড় শাল, সেগুন, শিরীষ গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। অজস্র আম গাছ। প্রায় প্রত্যেকটা বাড়ির গায় লতানে গোলাপ গাছ আগাছার মতো হয়ে আছে। গাছগুলো সাদা গোলাপে ভরা। ফুলগুলো গাছেই হয়, গাছেই শুকিয়ে যায়।

রাজা বললো, ঐ দ্যাখ, এইটাই ফায়ারিং রেঞ্জ।

ওরা অবাক হয়ে দেখলো, শুধু মাঠ। অনেক দূরে মাটির উঁচু পাহাড়ের মতো। তার মাথায় লাল পতাকা।

রাজা বললো, এখানে ফায়ারিং হয়, টেস্টিং হয়...

টেস্টিংটা কী?

মটার-টটার হবে। আমি অতো জানি না। বাবাকে জিজ্ঞেস করিস।

বিশাল ফাঁকা জায়গা ছাড়া ওখানে দেখার কিছু নেই। মিউ বললো, চলো যাওয়া যাক।

ওরা ওপাশ দিয়ে ঘুরে সি বি আর আই কলোনির মধ্যে দিয়ে চললো। উঁচু-নিচু রাস্তা পেরিয়ে ইউনিভারসিটির মধ্যে দিয়ে শর্টকাট করে পোলারিস হোটেলের সামনে দিয়ে ওরা এসে পৌঁছুলো রুড়কি-মিরাট রোডে। একটা বাস হুহু করে চলে গেলো হরিদ্বারের দিকে।

মিউ বললো, চলো জলসেতুটা দেখে আসি।

বড় রাস্তা ধরে ওরা এগিয়ে চললো।

হঠাৎ জিমিকে খুব লেজ নাড়তে দেখে অবাক হলো বাবু। রাজা হেসে বললো, ঐ দ্যাখ সিংহদাদুর বাড়ির গেটের কাছে গৌরীদিদি-মৌরীদিদি দাঁড়িয়ে আছে।

কাছে আসতেই গৌরীদিদি জিজ্ঞেস

এগিয়ে যেতে লাগলো কারখানাটার দিকে।

করলো, কোথায় যাচ্ছো তোমরা?

রাজা বললো, জলসেতু দেখতে।

মৌরীদিদি জিমিকে ডাকলো, এই জিমি, আয়...

জিমি একটু দাঁড়িয়ে লেজ নাড়লো। তারপর এক ছুটে মিউ-এর কাছে চলে এসে ওদের সঙ্গে হাঁটতে লাগলো। রুড়কি-মিরাট রোড ধরে ওরা এগিয়ে গেলো। সিনেমা হলে মাইকে গান বাজছে। দূরে কারখানাটা দেখা যাচ্ছে। সিপাই বিদ্রোহের সময় এখানকার ইংরেজরা ঐ কারখানায় লুকিয়েছিলো। পুরনো রুড়কি যাবার ব্রিজটা পেছনে ফেলে ওরা এগিয়ে গেলো জলসেতুর দিকে। খালের ধার দিয়ে রাস্তা। একটা-দুটো গাড়ি যাচ্ছে। কখনো বাস। হরিদ্বার-ঋষিকেশ-দেরাদুন যাচ্ছে। বদ্রীনাথ-কেদারনাথেও এই পথ দিয়েই যেতে হয়।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওরা এসে দাঁড়ালো জলসেতুর ওপর। নিচে সোলানি নদীর অল্প জল বিকেলের রোদে চিকচিক করছে। প্রায় একশ ফুট নিচে নদী। সেতুর পাশ দিয়ে সিঁড়ি নেমে গেছে। খালটা ২২৫ ফুট চওড়া। গভীরতা বেশি নয়। বারো ফুট। ওরা চারপাশটা দেখছিলো। নিচে নদী, ওপরে খাল। ভারি অদ্ভুত। কটলে সাহেবের কথাই ওদের বারবার মনে পড়ছিলো। চোখে ভাসছিলো সেই দৃশ্য। পেছন থেকে হুহু করে এগিয়ে আসছে খালের জল আর কটলে সাহেব মাথায় মুকুট পরে, ঘোড়ায় চড়ে শাঁখ বাজাতে বাজাতে সেতুর ওপর উঠছেন। জলের চাপে সেতু ভেঙে পড়লে তিনিও প্রাণ বিসর্জন দেবেন।

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে নামতে ওরা নদীর ওপর গ্রাম দেখতে পেলো। খেতের কাজ সেরে কৃষকরা ঘরে ফিরছে। কেউ কেউ সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে রুড়কি বাজারের দিকে চলেছে। জিমির এদিকটা সব চেনা। ও চটপট নিচে নামতে লাগলো। ওই যেন ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মিউ বললো, কি সুন্দর দেখেছিস! কতোদিন আগে তৈরি, তখন সিমেন্টও আবিষ্কার হয়নি, অথচ কতো মজবুত দ্যাখ!

ওরা নিচে নেমে চারপাশটা ঘুরে ঘুরে দেখছিলো। সেতুটা কতো ওপরে। রাজা নদীর দিকে এগিয়ে গিয়ে জল ছিটোচ্ছে। এখানে নদীর ধারে কাদা হয় না। পাথর আর শক্ত মাটি। মিউ বললো, চলো না বাবুদাদা, সেতুর তলা দিয়ে ওদিকটায় যাই।

চল।

ওপর দিয়ে একটা বাস যাচ্ছে। নিচে তার শব্দ। ওরা ওপর দিকে তাকিয়ে দেখে, কতো উঁচু!

দারুণ না! মোমার চোখে বিস্ময়।

কিকি আবার জিমির পিঠের ওপর উঠে বসেছে।

বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে। সূর্যদেব পাহাড়ের আড়ালে গা ঢাকা দিলেন বলে। জলসেতুর তলাটা অন্ধকার অন্ধকার।

কি সুন্দর গাঁথনি দেখেছিস! মিউ হাত দিয়ে দেখতে দেখতে বললো। তারপরই ও ভীষণভাবে চমকে উঠলো। ওর মনে হলো, কেউ যেন সদ্য মাটি খুঁড়ে কিছু পুঁতেছে। মিউ লক্ষ্য করলো এক জায়গায় নয়, ঘোড়ার দাগটা টানা চলে গেছে সেতুর তলা

দিয়ে। শক্ত মাটি আর মিউ-এর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বলে ব্যাপারটা বুঝতে তেমন অসুবিধে হচ্ছে না। মিউ চাপা গলায় বাবুকে ডাকলো। বাবু কাছে আসতেই বললো, নিচে দেখো, মনে হচ্ছে কিছু যেন পোঁতা।

বাবু নিচু হয়ে মাটি হাত দিয়ে তুলে দেখে বললো, তার।

তার? মিউ ভীষণ অবাক।

অন্যরা কথা বলতে বলতে এগিয়ে যাচ্ছে। মিউ চাপা গলায় বললো, ব্যাপারটা সন্দেহজনক।

হুঁ।

মিউ জিমিকে ডাকলো। জিমি ছুটে আসতেই ওকে তারটা শুঁকিয়ে কি করতে হবে বুঝিয়ে দিলো। জিমি গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে দ্রুত সেতুর তলা পেরিয়ে ওপারে চলে গেলো। পেছনে ওরা। জিমি থামলো না। এগিয়ে যেতে লাগলো কারখানাটার দিকে। অন্যরা ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি। মোমা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, এই জিমি, কোথায় যাচ্ছিস?

কিকি গম্ভীর গলায় বললো, চেঁচিও না—জিমি কাজ করছে।

রাজা, মোমা আর বুয়া অবাক হয়ে বাবু আর মিউ-এর দিকে তাকালো। মিউ বললো, সেতুর তলা দিয়ে কেউ তার পুঁতেছে।

তার মানে? বাবুর কথা শেষ হবার আগেই রাজা বলে উঠলো, হাইলি সাসপিসাস।

জিমি অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলো। কিকি উড়ে গেলো জিমির দিকে। ওরাও পায় পায় এগোচ্ছিলো। সূর্য পাহাড়ের আড়ালে হারিয়ে গেছে। পাহাড়ের ছায়া অন্ধকারের আঁচল গায় জড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। পশ্চিমাকাশে পাহাড়ের ঠিক ওপরটা লাল। সূর্যদেব ঘুমোতে যাবার আগে লাল হাসিতে রাঙিয়ে দিয়েছেন আকাশ।

বাবু বললো, চল এবার ফেরা যাক।

মিউ চিৎকার করে জিমিকে ডাকলো। জিমি ছুটে এলো ওদের কাছে। কিকি এসে বসলো বুয়ার কাঁধে। ওরা সেতুর তলা দিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতে গিয়েই থমকে দাঁড়ালো। মিউ স্পষ্ট দেখলো, ওদের ফিরতে দেখে একটা লোক চকিতে সরে গেলো। ওরা তাড়াতাড়ি সিঁড়ির কাছে গেলো। সিঁড়ি দিয়ে কাউকে উঠতে দেখলো না। আশেপাশেও কেউ নেই।

মিউয়ের মনে সন্দেহ দানা বেঁধে ওঠে। সেতুর তলায় তার পোঁতা, অলক্ষ্যে ওদের একটা লোকের লক্ষ্য করা—এর মধ্যে কোনো যোগসূত্র আছে নাকি? কে জানে! তবে ব্যাপারটা রীতিমতো গোলমেলে।

ওরা তাড়াতাড়ি সেতুর ওপরে উঠে আসে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। সেই সঙ্গে ঠাণ্ডাও বেড়ে গেছে। ওদের বেশ শীত শীত করছে। রুড়কি শহরের আলো জ্বলে উঠেছে। খালের জলে তার প্রতিফলন। ওরা তাড়াতাড়ি হাঁটে। ব্রিজ পার হয়ে বড় রাস্তা দিয়ে না গিয়ে ওরা ক্যানেল ব্যাঙ্ক রোড ধরে ক্যান্টনমেন্টের দিকে এগিয়ে চলে। এই রাস্তাটা ভারি সুন্দর। খালের ধার বরাবর রাস্তা। দুপাশে বড় বড় গাছ। ওপারে বোট ক্লাব, ইরিগেশন অফিস পার হয়ে ওরা এগিয়ে এসে সেনানিবাসে ঢুকে পড়ে। জিমিও ওদের সঙ্গে সঙ্গে এলো।

ক্যান্টনমেন্টের সেন্ট্রিরা ওদের চিনে গেছে। রাজাকে তো আগে থেকেই চিনতো। ওখানে বাইরের লোক ঢুকতে পারে না। সন্ধ্যের পর তো একেবারেই না। ডান দিকে জওয়ানদের ব্যারাক—অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। বাঁদিকে অফিসারদের কোয়ার্টার। রাজাদের কোয়ার্টার বিশাল কমপাউন্ডের মধ্যে। গেটের কাছে দুজন সেন্ট্রি।

ও বাড়ি ফিরেই বুঝলো, পরিবেশ রীতিমতো থমথমে। একটু আগে মেজদা ফিরেছেন। মামণি বললেন, তোরা এতো দেরি করলি, আমার খুব চিন্তা হচ্ছিলো।

কেন! সবে তো সন্ধ্যে!

তা না। যা সব হচ্ছে।

কী হয়েছে মা?

রায়দাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

সে কী!

রায়দা কে?

ক্যাপটেন রায়। গোলাঘরের চার্জে আছেন।

গোলাঘরটা কি?

গোলাবারুদ থাকে যেখানে।

বাবু তাকালো মিউয়ের দিকে। মিউয়ের চোখে সন্দেহের ছায়া। সে ইশারায় বাবুকে

ছ'সাতটা পরে একটার রং একটু কাঁচা মনে হলো।

কিছু বলতে বারণ করলো।

মামণি বললেন, তোরা হুট-হাট করে যেখানে-সেখানে যাস নে! কী যে হচ্ছে বুঝি না।

আমরা তো জলসেতু দেখতে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে সোজা ফিরে এলাম।

মামণি আর কিছু বললেন না। চলে গেলেন। একটু পরে অর্ডারলি এসে গরম সিঙ্গাড়া, মিষ্টি আর দুধ-চা দিয়ে গেলো। ওরা কিছুতেই দুধ খেতে চায় না বলে মামণির এই ব্যবস্থা। ফুটন্ত দুধে একটু চা ফেলে, ছেঁকে, চিনি দিয়ে গুলে দুধ-চা করে দেন। ওরা খুশি হয়ে খায়।

সিঙ্গাড়ায় কামড় দিয়ে মিউ বললো, বাবুদাদা, ব্যাপারটা গোলমেলে মনে হচ্ছে।

এ কথা বলছিস কেন?

জলসেতুর তলায় তার পোঁতা। সেখানে গেছি বলে আমাদের ওপর নজর রাখা, তার ওপর এই ক্যাপ্টেন রায়ের নিখোঁজ হওয়া। একটু চিন্তা করো, দেখবে তিনটে ঘটনার এক যোগসূত্র আছে।

তার মানে তুই বলতে চাইছিস, একটা কিছু এখানে ঘটতে চলেছে।

হুঁ। কিন্তু জলসেতুর তলায় তার পোঁতা কেন?

সেইটাই তো রহস্য!

আমরা পারবো না এর সমাধান করতে?

মেজদা জানতে পারলে ভীষণ রেগে যাবেন। পত্রপাঠ আমাদের বাড়ি ফেরত পাঠিয়ে দেবেন। মুসৌরি যাওয়া তাহলে আর হবে না।

আমরা চুপ করে বসে থাকবো? বাবু হতাশ গলায় বললো।

মোটেই না। যা করার চুপিচুপি করবো আমরা। কিন্তু গোলা-বারুদের ঘরে আমাদের একবার যাওয়ার দরকার। রাজাদাদা, বলো তো কিভাবে সেখানে যাওয়া যায়?

রায় আঙ্কেল থাকলে কোনো অসুবিধেই হতো না। দেখি কাল সকালে কি করা যায়! বাবা বেরিয়ে যাবার পর আমরা বেরুবো। সোজা ওখানে যাবো। কেউ না কেউ চেনা বেরোবেই। কিন্তু ওখানে যেতে চাইছিস কেন রে মিউ?

এমনি গোলা-বারুদ দেখতে।

আমায় বোকা বানাসনে মিউ।

মিউ হেসে ফেললো। বললো, বুঝতে পারছো না কেন?

রাজা মাথা নেড়ে গম্ভীর গলায় শব্দ করলো, হুঁ।

হেসে উঠলো বাবু। তারপর ক্যারমবোর্ডটা পেতে বসে পড়ে বললো, আয় খানিকক্ষণ খেলা যাক। ঘুঁটি সাজাতে সাজাতে রাজার দিকে তাকিয়ে বাবু বললো, কাল যেভাবেই হোক গোলাঘরে যেতেই হবে। ব্যবস্থা করতে পারবি তো?

রাজা হাসলো। কিছু বললো না।

মিউ বললো, জিমিটাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে আসি।

কেউ কিছু বলবে না তো? মোমা উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

রাজা হাসলো। বললো, ওকে এখানে সকলে চেনে। ও ঠিক চলে যাবে।

॥ তিন ॥

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট সেরেই মেজদা বেরিয়ে গেলেন। খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে তাঁকে। ক্যাপ্টেন রায়ের কোনো খবর নেই। চব্বিশ ঘণ্টা কেটে গেছে। ওপর মহলে খবর দিতে হবে। মেজদার কাছে ওরা শুনেছে, এখন ক'দিন ফায়ারিং বন্ধ থাকবে। ওরা একটু পরেই বেরিয়ে পড়লো। জিমি আগেই এসে হাজির হয়েছিলো। ও-ও চললো পেছনে পেছনে। কোয়ার্টার থেকে বেরোতেই ওরা বুঝতে পারলো, পুরো ক্যান্টনমেন্টটা তটস্থ হয়ে আছে। নিরাপত্তার ব্যবস্থাও অনেক জোরদার। অবশ্য তাতে ওদের কোনো অসুবিধে হলো না। ওদের সকলেই চিনে গেছে। যারা চিনতো না তারাও রাজা আর জিমিকে দেখে ওদের পরিচয় আঁচ করে নিলো।

গোলাঘরে পাহারা সব সময়ই বেশি। আজ তো আরো বেশি। কিন্তু লেঃ বিস্ট বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন। ক্যাপ্টেন রায় ছিলেন দায়িত্বে। তাঁর সহকারী লেফটেন্যান্ট বিস্ট। রাজা অনেকবার এসেছে ক্যাপ্টেন রায়ের সঙ্গে। লেঃ বিস্ট ওকে ভালো করেই চেনেন। রাজা সোজা ওঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে বললো, আমার ভাইবোনেরা কলকাতা থেকে এসেছে। গোলা-বারুদ, অস্ত্রশস্ত্র একটু দেখিয়ে দেবেন?

লেঃ বিস্ট একটু ইতস্তত করছিলেন। খবর আছে ব্রিগেডিয়ার ব্যানার্জি একটু পরেই আসবেন। এখন তাঁর ছেলে এসে

দেখতে চাইছে। উনি ভাবলেন, রাজারা বোধহয় ক্যাপ্টেন রায়ের নিখোঁজ হয়ে যাবার খবর জানে না। তা না জানাই ভালো। একটু চিন্তিত মুখে বললেন, খুব তাড়াতাড়ি দেখে নিতে পারবে তো? এক্ষুণি তোমার বাবা আসবেন।

ওরা এর ওর মুখের দিকে তাকালো। এখানে দেখলে ওরা নির্ঘাৎ বকুনি খাবে। রাজা বললো, চলুন পাঁচ মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে আসবো।

ওদের নিয়ে লেঃ বিস্ট গোলাঘরে ঢুকলেন। ওরা প্রথমে এক্সপ্লোসিভের খোঁজ করায় সেখানেই নিয়ে গেলেন। পরপর সাজানো রয়েছে গোলা। রং করা। লেঃ বিস্ট বললেন, এই সবুজ রং করাগুলো কম পাওয়ারফুল। এক্সপেরিমেন্ট করা হবে নেকস্ট ডে। লালগুলো সাংঘাতিক পাওয়ারফুল। এখানে এক্সপেরিমেন্ট করা যায় না। রুড়কির মতো শহর নিমেষে উড়িয়ে দিতে পারে ওগুলো।

বাবু এগিয়ে গিয়ে সবুজ রং করা বোমাগুলো হাত দিয়ে দেখছিলো। ছ-সাতটার পরে একটার রং একটু কাঁচা মনে হলো। বাবু আঙুল তুলে দেখলো, রং লেগেছে। চট করে আঙুল দিয়ে আর একটু ঘষলো। একটু যেন লালচে আভা। বাবু কাউকে কিছু বললো না। এগিয়ে গেলো। লেঃ বিস্ট বললেন, পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে। চলো বাইরে যাই।

ওরা ওঁর সঙ্গে বাইরে এসে লেঃ বিস্টকে ধন্যবাদ জানিয়ে হাঁটতে শুরু করলো। খালের ধার দিয়ে ওরা হাঁটছে। বাবুকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে। ও দেখেছে লাল রং-এর এক্সপ্লোসিভের ওপর সবুজ রং করা। কিন্তু কেন? ওদিকে ক্যাপ্টেন রায়ের খোঁজ নেই। এই দুটো ব্যাপার ওকে যেমন ভাবাচ্ছে তেমনি চিন্তিত করে তুলেছে পোলের তলায় পোঁতা তার। সবগুলোর মধ্যে কি কোনো যোগসূত্র আছে? তাহলে ব্যাপারটা কি? সাঙ্ঘাতিক কিছু বলেই তো মনে হচ্ছে। তবে কি এখানে একটা বিশাল বিস্ফোরণ ঘটানোর ষড়যন্ত্র চলছে? বম্বে ব্লাস্টের ভয়াবহতার কথা ওরা জানে। এখানেও কি সেইরকম কিছু করার তালে আছে জঙ্গিরা। জলসেতু উড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা নেই তো? বাবুর মনের মধ্যে ধক্ করে উঠলো। এখুনি মিউকে বলতে হবে ওর সন্দেহের কথা। গোলাঘরের রং-করা এক্সপ্লোসিভটাই ওর চিন্তা সব থেকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

মিউ বুঝতে পেরেছিলো বাবু কিছু চিন্তা করছে। ও এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, মনে হচ্ছে কোনো ব্যাপার নিয়ে খুব চিন্তা করছো বাবুদাদা?

বাবু ওর সন্দেহের কথা খুলে বললো। চমকে উঠলো মিউ। বললো, তোমার কি আগেই সন্দেহ হয়েছিলো? তা না হলে এক্সপ্লোসিভের কনটেনারের রং দেখতে গেলে কেন?

না, আগে কিছু মনে হয়নি। কিন্তু ওখানে গিয়ে একটার রং কাঁচা মনে হয়েছিলো। তাই হাত দিয়ে দেখছিলাম।

আমার কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই সুবিধের ঠেকছে না। মনে হচ্ছে, বিরাট একটা চক্রান্ত রয়েছে এর পেছনে। জঙ্গিদের কাজ নয়তো?

হতে পারে। জলপুলটা উড়িয়ে দিতে পারলে ইউ পি-র বিশাল অঞ্চলের চাষবাস নষ্ট হয়ে যাবে। আর শুনলি তো লাল এক্সপ্লোসিভগুলোর একটাই রুড়কি শহরটা উড়িয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

কথা বলতে বলতে ওরা পুরনো রুড়কি যাবার পোলের কাছাকাছি এসে গিয়েছিলো। মিউ বললো, চলো না কারখানার চারপাশটা ঘুরে দেখি। পরে ওখান দিয়েই নিচে নেমে জলসেতুর তলায় নদীর ধারে যাবো।

ওরা কারখানার দিকে এগিয়ে চললো। বেলা তখন সবে নটা। রাস্তা ফাঁকা ফাঁকা। খালের ওপারে পুরনো বাজারের দিকটায় খুব ভিড়। শীতটা একটু কমই লাগছে। কদিনে সহ্য হয়ে যাচ্ছে তো। তা ছাড়া শীতের সেই ভয়ঙ্কর কামড়টা একটু কমেছে। জিমির পথঘাট চেনা। ও আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। রাস্তার কুকুরগুলো জিমিকে চেনে। একটু সমীহও করে। ওরা লক্ষ্য করেছে, কোনো কুকুরই বীরত্ব দেখাতে জিমির দিকে এগিয়ে যায় না। অথচ কুকুরদের মতো সীমানা-সচেতন জীব খুব কমই আছে।

দেখলেই বোঝা যায় কারখানাটা খুবই পুরনো। এখনো টুকটাক কাজ হয়। হালে নাকি কি সব গণ্ডগোল-টোল হওয়ায় বন্ধ আছে। গেটে তালা ঝুলছে। বাবু বললো, ভেতরে লোক আছে মনে হচ্ছে।

গেটে তালা যে! মিউ অবাক হয়ে বললো।

গেটের কাছে দ্যাখ টাটকা ছাপ।

মিউ ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলো, কয়েক জোড়া ভারী জুতোর ছাপ গেটের কাছে। জুতোর দাগগুলো কারখানার মধ্যে চলে গেছে।

কারখানার লোকজন এরকম জুতো পরে না। ছাপটা অনেকটা ফৌজি জুতোর মতো।

হুঁ! মিউকে খুব চিন্তিত দেখালো।

বাবু বললো, চল, এখানে বেশিক্ষণ না থাকাই ভালো।

কিকি একটা গাছের ডালে বসেছিলো। জিমি পাশেই ছিলো। ও কারখানার পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলো। মিউ রাজাকে জিজ্ঞেস করলো, রাজাদাদা, আবার কবে ফায়ারিং হবে?

আজই তো হবার কথা ছিলো। হয়তো কাল হবে।

বন্ধ করতে হবে।

মানে?

মেজদাকে বলে ফায়ারিংটা কাল বন্ধ রাখতে হবে।

কথা বলতে বলতে ওরা বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিলো। কারখানার পাশ দিয়ে নিচে নেমে গিয়ে ওরা নদীর ধারে যাবে বলে ঠিক করে রেখেছিলো। সেই দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিলো ওরা। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো জিমির ডাক শুনে। মিউ বললো, নড়িস না। জিমি আমাদের সতর্ক করে দিচ্ছে।

কেন, কি হয়েছে? মোম্মা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো।

কিকি গাছের ডাল থেকে নিচে নেমে এসে মিউয়ের কাঁধে বসেছিলো। গম্ভীর গলায় কিকি বললো, ঐ বাড়িটা থেকে একটা লোক দেখছে!

আমাদের?

হুঁ!

আশ্চর্য! বাড়িটায় তালা দেওয়া রয়েছে।

রাজার কথা শেষ হলো না, বাবু বলে উঠলো, লোককে বোকা বানাবার এইটাই তো সোজা রাস্তা। গেটে তালা দেওয়া

দেখে সকলে ভাববে কেউ নেই, সেই সুযোগে ওরা ওর মধ্যে বসে যা করার করবে। কেউ বুঝতেও পারবে না। কিন্তু বন্ধ কারখানার মধ্যে কারা?

ওরা কারখানার পাশ দিয়ে নিচে নেমে যায়। ওপরে খাল। একটু দূরে ওপাশে নদী। বেশ চওড়া। এখন জল বেশি নেই। অনেক দূরে হিমালয়। নিচে নেমেছে বলে তুষারশৃঙ্গগুলো দেখা যাচ্ছে না। একটু দূরে গ্রাম। ক্ষেতে ফসল নেই। গরু-মোষ চরছে।

রাজা বললো, বাবাকে বলে গাড়ি নিয়ে হরিদ্বার, ঋষিকেশ, লছমনঝুলা আর কনখল দেখতে যেতে হবে।

কনখলেই তো দক্ষরাজার বাড়ি ছিলো। দক্ষযজ্ঞ হয়েছিলো।

প্রজাপতি দক্ষর বাড়ির ভগ্নাংশ এখনো আছে। যেখানে দক্ষযজ্ঞ হয়েছিলো সেখানে এখন মন্দির। গঙ্গার ঘাটে সতীর পায়ের ছাপ আছে।

সত্যি! মোমা অবাক হয়ে তাকায় রাজার দিকে।

হ্যাঁরে, আমি দেখে এসেছি। মা পুজো দিয়েছিলেন।

মিউ বললো, এই খালটা যেখানে ঝরণানদীর তলা দিয়ে গেছে সেইখানটা আমি দেখতে চাই।

ওরা গল্প করতে করতে এগোচ্ছিলো। বাবুর কিন্তু সেদিকে মন ছিলো না। ওর মনে নানা প্রশ্ন। ওর খালি মনে হচ্ছিলো, একটা বড় বিপদ এগিয়ে আসছে। কিভাবে, কোথা দিয়ে তা যদি ও বুঝতে পারতো! ওরা ততোক্ষণে জলসেতুর তলায় পৌঁছে গেছে। ওরা চারপাশটা ঘুরে ঘুরে দেখছিলো। বাবু জিমিকে নিয়ে মাটির তলায় লুকিয়ে রাখা তারের সন্ধানে গেলো। তারটা খুঁজে বের করতে খুব একটা সময় লাগলো না। বাবু তারটা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে দেখার জন্যে পায় পায় এগোতে লাগলো।

মিউ বাবুর দিকে লক্ষ্য রেখেছিলো। ছুটে এসে জিজ্ঞেস করলো, কি দেখছো বাবুদাদা?

তুই ওদের কাছে যা। আমি তারটা কোথা থেকে এসেছে দেখার চেষ্টা করছি। মনে হচ্ছে কারখানাটা থেকেই কলকাঠি নাড়ানো হচ্ছে।

তুমি ওখানে যাবে নাকি?

এখনই যাবো না। তোরা গিয়ে খেলা কর। মনে হচ্ছে কারখানা থেকে আমাদের ওপর চোখ রাখা হয়েছে। আমাদের ওপর ওদের যদি কোনোভাবে সন্দেহ হয় তাহলে কিন্তু বিপদ হতে পারে। তুই যা, ওদের সঙ্গে নিয়ে খেলা-টেলা কর। যাতে মনে হয় আমরা এমনি এসে নদীর ধারে খেলছি।

তুমি কিন্তু বন্ধ কারখানাটার বেশি কাছে যেও না। আর খানিকটা এগোলেই তো বুঝতে পারবে, তারটা কোথা থেকে আসছে।

ঠিক আছে, তুই যা!

মিউ চলে এলো। নদীর ধারে জলের কাছাকাছি গিয়ে ওরা মাছ দেখার চেষ্টা করছে। ওপরের খালে বড় বড় মাছ আছে। মহাশোল। একদম পোনা মাছের মতো দেখতে। হরিদ্বারে অনেক আছে। ওখানে কেউ ধরে না। কিন্তু খালের মাছ মাঝে মধ্যে ধরা পড়ে। ছোট দু-চারটে মাছ ওদের চোখে পড়লো।

ওদিকে জিমি মাটির তলায় পোঁতা তারটা শুঁকতে শুঁকতে এগিয়ে চলেছে। পেছনে বাবু। বাবু লক্ষ্য করলো, ও প্রায় বন্ধ কারখানাটার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। বাবু এখন নিশ্চিত, তারটা এসেছে কারখানা থেকেই। বাবু ধীর পায়ে ফিরে চললো নদীর দিকে। ওর মাথায় একরাশ চিন্তা।

মিউ কিকিকে পাঠিয়েছিলো কারখানার মধ্যেটা দেখে আসার জন্যে। বলে দিয়েছিলো, কারখানার মধ্যে অনেক গাছ আছে, তারই একটার ওপর বসে লুকিয়ে লুকিয়ে সবকিছু লক্ষ্য করতে। কিকি এখনো ফেরেনি। মিউ বারবার তাকাচ্ছিলো কারখানার দিকে। কিকিকে দেখতে খুব সুন্দর। অমন সুন্দর একটা কাকাতুয়া দেখলে তার ওপর নজর পড়বেই। তাই কিকিকে ডালপালার আড়ালে লুকিয়ে থাকতে বলেছে মিউ। বাবু ফিরে এলো, কিন্তু কিকি আসছে না কেন?

কি দেখলে? মিউ চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলো।

তারটা কারখানার মধ্যে থেকেই আসছে।

এর মানেটা বুঝতে পারছো?

হ্যাঁ, জলসেতুটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা হবে।

হুঁ!

কি করবে এখন? মিউ জিজ্ঞেস করলো।

বুঝতে পারছি না। বিকেলে আবার আসবো—চল এবার ফেরা যাক।

মেজদাকে কিছু বলবে?

পাগল নাকি—তাহলে আমাদের আর বেরোতে দেবে না।

ওরা জলসেতুর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলো রুড়কি ব্রিজের দিকে। ব্রিজ পার হয়ে ক্যানেল ব্যাঙ্ক রোড ধরে ওরা হাঁটতে লাগলো ক্যান্টনমেন্টের দিকে। এখন আর শীত-টিত করছে না। দুদিনেই ওরা দিব্যি জায়গাটার সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে। আলাপ-পরিচয়ও হয়েছে দু-চারজনের সঙ্গে। তবে তাঁরা প্রায় সকলেই আর্মি অফিসার। কিকিরও বন্ধু জুটেছে। প্রায়ই তাকে গাছের ওপর বন্ধুদের সঙ্গে দেখা যায়।

ওরা যখন বাড়ি পৌঁছুলো তখন সবে এগারোটা। ওরা ক্যারম খেলতে বসলো। বাবু ওদের সঙ্গে খেলতে না বসে তার ডায়েরিটা বের করে নোট করতে শুরু করলো। আজ সকালে গোলাঘরে গিয়ে যা দেখেছে সেখান থেকে আরম্ভ করে বন্ধ কারখানায় লোক, তার সবই সে লিখে ফেললো।

মিউ বাইরে গিয়ে কিকির সঙ্গে কথা বলছিলো। একটু পরে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকে বাবুকে ডাকলো।

বাবুদাদা, কিকি বন্ধ কারখানার মধ্যে তিন-চারজন লোককে দেখে এসেছে। লোকগুলোর হাতে অস্ত্রও ছিলো।

আর?

কারখানার ওপরে একটা ঘর আছে। সেখানে বসে একটা কিছু চোখে লাগিয়ে একজন কিছু দেখছিলো।

তার মানে আমাদের লক্ষ্য করছিলো। তারটা যে আমরা দেখতে পেয়েছি সেটাও ওরা বুঝে গিয়ে থাকবে।

হতে পারে।

আমাদের এবার সতর্ক হতে হবে। সাবধান না হলেই আমাদের ওপর ওরা কিন্তু আঘাত হানবে।

॥ চার ॥

দুটোর সময় মেজদা ফিরে এলেন। তাঁকে খুবই চিন্তিত দেখাচ্ছিলো। বললেন, ক্যাপ্টেন রায়ের কোনো খোঁজই পাওয়া যায়নি। খুবই চিন্তার ব্যাপার। দিল্লীতে জরুরি খবর পাঠিয়েছি।

খেতে বসে রাজা বললো, আমরা হরিদ্বার-টরিদ্বার দেখতে যাবো। গাড়ির ব্যবস্থা করে দিও।

তা যাস। যেদিন বলবি সেদিনই ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তোরাও একটু সাবধানে ঘোরাঘুরি করিস। কোথা দিয়ে যে কী হবে কিছু বুঝতে পারছি না।

ফৌজি ব্যাপার, তাই কেউ কিছুই জানে না। গোপনে তল্লাশি চলছে। স্টেশন, বাস টারমিনাস সব জায়গাতেই মিলিটারি পুলিশের পাহারা। কিন্তু ক্যাপ্টেন রায়ের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

ক্যানটনমেন্ট থেকে বেরিয়ে ওরা রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলো। দুপাশে বড় বড় গাছ। চকচকে পিচের রাস্তা। মাঝে মাঝে এক একটা বাস যাচ্ছে। গাড়ি চলছে। রিকশা টাঙ্গাও চলছে। দুপুর গড়ালেই ঠাণ্ডাটা এখানে বেশ জমিয়ে পড়ে। বুয়া আর মোমা গায় একটা করে চাদর নিয়েছে। অন্যদের গায় সোয়েটার। জিমি চলেছে সবার আগে আগে। কিকি মিউ-এর কাঁধে।

মিউ আস্তে আস্তে বাবুকে বললো, জলসেতুর তলায় তার দেখে কি তোমার কিছু সন্দেহ হচ্ছে বাবুদাদা?

হচ্ছেই তো! মনে হচ্ছে জলসেতুটা উড়িয়ে দেবার প্ল্যান করেছে।

কারা?

কারা আবার জঙ্গিরা। তা ছাড়া ক্যাপ্টেন রায়ের নিখোঁজ হওয়া, গোলাঘরে এক্সপ্লোসিভের গায় টাটকা রং—সব কিছুর মধ্যেই একটা যোগসূত্র আছে। মনে হচ্ছে একটা বিরাট চক্রান্তের জাল বিছানো হয়েছে।

আমাদের সন্দেহের কথা মেজদাকে বললে হয় না?

মিউ-এর কথা শুনে বাবু হাসলো, মেজমামা হেসে উড়িয়ে দেবে। তারপর বকুনি দিয়ে আমাদের বাড়ি থেকে বেরুনো বন্ধ করে দেবে।

মিউ মাথা নাড়লো, ঠিকই বলেছে বাবুদাদা। কিন্তু কী হবে এখন—একটা কিছু তো করতেই হবে।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে ব্রিজের ওপর উঠে এলো। এখান থেকে তুষারশৃঙ্গ দেখা যায়। শিবালিক পর্বতশ্রেণী। বিকেলবেলার পড়ন্ত রোদে কী যে ভালো লাগে দেখতে। সেদিকে তাকিয়ে ওরা সময় নষ্ট না করে চলে এলো জলসেতুর ওপর। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে লাগলো। ওদের পাশ দিয়ে দুচার জন দেহাতী লোক মাথায় সব্জি-টব্জি নিয়ে চলে গেলো।

নিচে নেমে মোমা, রাজা আর বুয়া ছুটোছুটি শুরু করলো। জিমি গ্যাঁট হয়ে বসে তাই দেখছে। কিকি গিয়ে বসেছে একটা ঝোপের ওপর। বাবু চাপা গলায় মিউকে বললো, আমি তারটা ফলো করে এগিয়ে যাচ্ছি। তুই খেয়াল রাখিস।

বাবু দু-এক পা করে এগোচ্ছে। মিউ খানিকটা পেছনে। তারটা ফলো করে বাবু জলসেতুর পিলারের পাশ দিয়ে ডান দিকে অদৃশ্য হয়ে গেলো। সেই মুহূর্তে মিউ-এর কী যেন মনে হলো। জিমিকে ডাক দিয়েই ছুটে গেলো সে।

পিলারের পাশে তখন বাবু একটা তাগড়া লোকের সঙ্গে লড়ছে। বাবু পারবে কেন জওয়ান লোকের সঙ্গে। মিউ আর জিমি গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। জিমি কামড়ে ধরলো লোকটার কব্জি। মিউ ঘুঁষি চালাতে লাগলো দুমাদুম। ওদের আক্রমণ সামলাতে না পেরে লোকটা মাটিতে পড়ে গেলো। বাবু ওর বুকের ওপর চেপে বসে গলাটা টিপে ধরতেই ওর মনে হলো জায়গাটা যেন আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছে। মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে মিউ-এর হাত ধরে এক লাফে সরে এলো বাবু। পরমুহূর্তেই লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেলো ওদের চোখের সামনে থেকে। জায়গাটা দেখে বোঝার উপায় নেই যে এক মুহূর্ত আগেও একটা লোক ছিলো। জিমি এসে লেজ নাড়তে নাড়তে ওদের পাশে দাঁড়িয়েছে। বাবু গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বললো, এবার বুঝছিস তো ব্যাপারটা কিরকম গোলমেলে।

হুঁ। একটা বিষয় খেয়াল করেছো?

কি?

ওরা আমাদের ওপর কিরকম নজর রেখেছে। যেই দেখলো লোকটাকে আমরা প্রায় কব্জা করে ফেলেছি, অমনি সরিয়ে নিলো।

এই জায়গাটা মনে রাখতে পারবি?

পারবো। পিলারের পাশ দিয়ে ডান দিকে ঘুরে চার পা...

ওরা আর দেরি করলো না। সন্ধ্যে হয় হয় দেখে বাড়ির পথ ধরলো। এতো কাণ্ড হয়ে গেলো রাজা, মোমা, বুয়া কিন্তু কিছু বুঝতে পারেনি। সিংহদাদুর বাড়ি ছাড়িয়ে পোলারিস হোটেল পেছনে ফেলে ওরা হাঁটছে। ডানদিকে বিশাল আন্তঃরাজ্য বাস-স্ট্যান্ড। তারপর আরও খানিকটা এগিয়ে বাঁ দিকে ঘুরে ওরা চলে এলো ক্যানটনমেন্টে। পাহারা আজ একটু জোরদার মনে হলো।

বাবু জিজ্ঞেস করলো, আজ সকালে মেজমামা কি বললেন রে, ফায়ারিং-টেস্টিং আবার কবে হবে?

কাল বাদে পরশু। দেখতে যাবি?

হুঁ!

বাবাকে বলে ব্যবস্থা করে রাখতে হবে।

বাবু মিউকে বললো, তার মানে কালকের দিনটা আমরা হাতে পাচ্ছি।

রাত্তিরে খেতে বসে বাবু মেজমামাকে জিজ্ঞেস করলো, জলসেতুটা যদি ভেঙে পড়ে তাহলে কি হবে?

সর্বনাশ হবে। রুড়কি শহরটা তো ডুবে যাবেই। আশেপাশের গ্রামগুলোও তলিয়ে যাবে। আর লক্ষ লক্ষ মানুষের চাষ-আবাদ, ফসল নষ্ট হবে। কোটি কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হবে।

একটু থেমে হেসে জিজ্ঞেস করলেন, এ কথা কেন জিজ্ঞেস করছিস রে?

না এমনি। একশ ফুট ওপর দিয়ে খালের জল যায়! দেখি আর অবাক হই!

সত্যি এ এক বিস্ময়কর কাজ। ভেবে দ্যাখ জলসেতুটা যখন তৈরি হয়েছে তখন সিমেন্টও আবিষ্কার হয়নি।

মামণি ব্ল্যাকফরেস্ট পুডিং দিতে দিতে বললেন, মিউ, তোর মার কাছ থেকে শিখেছি। খেয়ে বল কেমন হয়েছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর মিউ আর বাবু এসে বাইরে দাঁড়ালো। কনকনে ঠাণ্ডা। চারদিকটা বড্ড চুপচাপ। একটা গার্ডরুম থেকে দশটার ঘণ্টা ভেসে আসছিলো। বাবু বললো, কালকের দিনটা খুব ভাইটাল, জানিস।

কেন?

জানি না। আমার মনে হচ্ছে।

কাল তো ফায়ারিং-টেস্টিং নেই।

সেইটাই যা বাঁচোয়া। আমার একটা কথা মনে হচ্ছে কী জানিস।

কি?

ক্যাপ্টেন রায়কে ওরা ঐ কারখানার মধ্যে কোথাও বন্দী করে রেখেছে।

এ কথা কেন বলছো?

কী জানি, আমার কেমন মনে হচ্ছে। শোন, কাল ভোরবেলায় আমি একবার ওখানে যাবো।

একা?

হ্যাঁ।

তারপর যদি তুমি ধরা পড়ো?

আমি না ফিরলে তুই আমার খোঁজে যাস। কিকি আর জিমিকেও সঙ্গে নিবি। রাজাকে বলবি, আমরা সিংহদাদুর ওখানে আছি। রাত্তিরে নাও ফিরতে পারি।

তুমি একা যাবে? আমার ভয় করছে বাবুদাদা!

ভয়ের কিছু নেই। তুই শুধু ঐ জায়গাটা মনে রাখিস। জলসেতুর পিলার পেরিয়ে ডান দিকে ঘুরে চার পা...

তোরা ঠাণ্ডার মধ্যে বাইরে কি করছিস? ভেতরে আয়! মামণি তাড়া লাগালেন।

ওরা ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লো। কিকি আলমারির মাথায় চোখ বুজে বসেছিলো। গম্ভীর গলায় বললো, অনেক রাত হয়েছে, ঘুমিয়ে পড়ো। এই জিমি বাড়ি যা!

তুই চুপ কর। জিমি এতোক্ষণ বাড়ি গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

॥ পাঁচ ॥

সকালবেলায় চোখ মেলেই মিউ তাকালো বাবুর বিছানার দিকে। খালি। তার মানে বাবুদাদা ভোরবেলায় উঠে বেরিয়ে গেছে। কথা শুনলো না। একা একা গেলো। মিউয়ের চিন্তা হয়। মোমা, রাজাদাদাদের ডেকে মুখ-টুখ ধুয়ে ওরা গিয়ে ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসলো। মিউ চাপা গলায় বললো, তোরা বাড়ি থাকবি। বাবুদাদা ভোরবেলায় বেরিয়ে গেছে। আমি এক্ষুণি কিকি আর জিমিকে নিয়ে বেরুবো। না ফিরলে বলবি সিংহদাদুর বাড়ি গেছি।

সিংহদাদুর বাড়ি কী? মামণি হাত মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলেন।

বাবুদাদা ভোরবেলায় গেছে। সিংহদাদু হিমালয়ের একটা ম্যাপ দেখাবেন। আমিও এক্ষুণি যাচ্ছি। সিংহদাদু তোমায় বলতে বলেছেন, দেরি হলে আমরা ওখানেই খাবো।

মিউয়ের কথা শেষ হলো না মামণি জিজ্ঞেস করলেন, তুই একা যাবি?

হ্যাঁ! ওরা বাড়ি থাকবে। ওদের আজ ক্যারম কমপিটিশান।

মামণি আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। মিউ খেয়ে উঠে কিকি আর জিমিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। যেতে যেতে কিকি আর জিমিকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলো তাদের কি কি করতে হবে। জিমির মাথা নেড়ে দিয়ে বললো, কি রে, এই অঞ্চলের সব কুকুর নিয়ে তুই কারখানায় ঢুকে পড়তে পারবি তো?

জিমি লেজ নেড়ে ঘেউ ঘেউ করে সম্মতি জানালো। মিউ বললো, কারখানার সব কটা গেট তোরা পাহারা দিবি। আর কিকি, তুই একটু দূরে দূরে থাকবি। তোকে যেন কেউ দেখতে না পায়। আমার ইশারা শুনলেই উড়ে আসবি।

জলসেতুর তলাটা একদম ফাঁকা। কেউ নেই। বাবুদাদা এখানে এসেছিলো কিনা বোঝার উপায় নেই। কথা মতো মিউ পা টিপে টিপে এগোতে লাগলো। জিমি অনেক দূরে একটা ঝোপের আড়ালে বসে লক্ষ্য রাখছে। কিকি চুপ করে বসে আছে একটা গাছের ডালপালার আড়ালে। মিউ সাবধানে এগোতে থাকে। পিলারটা পেরিয়ে ডানদিকে ঘুরে চার-পা যেতেই কী যে হলো মিউ কিছু বুঝতে পারলো না। দেখলো, সে উল্টে একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। ভেতরে অন্ধকার। কিছু দেখতে পাচ্ছিলো না। কিন্তু কানে এলো একজনের গলা। হিন্দীতে বলছে, বস, আর একটা ফাঁদে পড়েছে।

নিয়ে যা, ঐ একটা ঘরে বন্ধ করে রাখ। টাইম হয়ে গেছে। আমি চললাম। ফাঁদটা লক করে দে।

ভারী বুটের শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলো।

মিউ ছিটকে পড়ে বেশ খানিকটা স্লিপ খেয়ে এগিয়ে এসেছিলো। অন্ধকারে চোখ সয়ে যেতে ও দেখলো, একটা কাঁচা সুড়ঙ্গ। পাশ দিয়ে মোটা তার যাচ্ছে। আর কিছু দেখার আগেই লোকটা এসে মিউকে টেনে তুলে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চললো। আরও খানিকটা যাবার পর সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে অন্ধকার কেটে গেলো। মিউ এসে হাজির হলো কারখানার চত্বরে। চারপাশে বড় বড় গাছ। মিউ দেখলো, একটা গাছের আড়ালে সাদা রং-এর একটা কিছু। ওর চিনতে ভুল হলো না। কিকি।

কারখানার গেটের বাইরে থেকে মোটর সাইকেলের আওয়াজ ভেসে এলো। লোকটা মিউকে ঠেলতে ঠেলতে কারখানার মধ্যে একটা ছোট বাড়ির সামনে এনে দাঁড় করালো। তারপর ঘরের তালা খুলে ওকে ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দরজায় বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিলো।

অন্ধকার ঘর। বাবুর গলা ভেসে এলো, মিউ আয়।

ওপরের ঘুলঘুলির মতো জায়গা দিয়ে একটু আলো আসছে। বাবু বললো, মিউ, ইনিই ক্যাপ্টেন রায়।

আমরা তাহলে ঠিক আন্দাজ করেছিলাম।

তুই সব ব্যবস্থা করে এসেছিস তো?

হ্যাঁ। কিকি কারখানার মধ্যেই আছে।

ক্যাপ্টেন রায় বললেন, যে করেই হোক কাল সকালের টেস্টিং বন্ধ করতে হবে। কাল ফায়ারিং-এর সময় ওরা শুধু জলসেতু আর এই কারখানাই নয়, ক্যান্টনমেন্টের এদিককার শহরটাই উড়িয়ে দেবে। এদের সর্দার একটু আগে চলে গেলো। ও আমারই ডিপার্টমেন্টে কাজ করছে গত এক মাস। আসলে ও ওখানে যশবীরের ছদ্মবেশে আছে। যশবীর যে কোথায় জানি না।

ওরা কারা রায়কাকু?

ওরা? খুব খতরনাক—ভিন দেশি জঙ্গি। আমাদের দেশে গোলমাল পাকাতে চাইছে। সব কিছু নষ্ট করে দিতে চাইছে।

বাবুদাদা, তোমার পকেটে নোটবুক আছে না? দাও তো!

মিউ নোটবুকের একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে ওদের সাংকেতিক ভাষায় লিখলো, রাজাদাদা, মেজদাকে বলে কালকের ফায়ারিং-টেস্টিং বন্ধ করিয়ে দাও। ক্যাপ্টেন রায়কে খুঁজে পেয়েছি।

মিউ জিজ্ঞেস করলো, আমরা তিনজনে মিলে লোকটাকে কাবু করে এখান থেকে

তো বেরিয়ে যেতে পারি।

অসম্ভব! এই দ্যাখো। ক্যাপ্টেন রায়ের হাত এবং পা লোহার চেন দিয়ে বাঁধা। বাবুর দুহাত পেছনে দড়ি দিয়ে বাঁধা।

আমায় বাঁধেনি তো! ভুলে গেছে বোধহয়। এইটাই আমাদের শাপে বর হবে।

ঠিক তক্ষুণি দরজাটা খুলে গেলো। লোকটা একটা দড়ি নিয়ে ঘরে ঢুকে বললো, বড় ভুল হয়ে গিয়েছিলো। দেখি খুকি তোমার হাতদুটো। মিউ ক্যারাটের একটা মার মারতে যাচ্ছিলো। বাবু ইশারায় বারণ করলো। মিউ-এর হাতদুটো পিছমোড়া বেঁধে লোকটা চলে গেলো। আবার অন্ধকার ঘর। ক্যাপ্টেন রায় বললেন, লোকটা এখন পাশের একটা ভাঙা ঘরে গিয়ে রান্না করবে। ঘণ্টা দুয়েক আর এদিকে আসবে না। বারোটার সময় রুটি আর সবজি নিয়ে যাবে।

মিউ বললো, এই সুযোগটাই আমাদের নিতে হবে। খাওয়ার জন্যে হাত খুলে দেবে তো?

হ্যাঁ।

তখন আমরা একসঙ্গে আক্রমণ করবো। জিমিকেও কারখানার মধ্যে এনে রাখতে হবে।

কি করে? ক্যাপ্টেন রায় অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

সে দেখতে পাবেন, এখন ঠিক করে বলুন দেখি এই মুহূর্তে কারখানায় একজনের বেশি জঙ্গি নেই তো?

আমি যতোদূর জানি নেই।

আমরা যদি কোনোভাবে গোলাঘরে যশবীরের ছদ্মবেশে যে লোকটা আছে তাকে ধরবার চেষ্টা করি?

তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। এরা সুইসাইড স্কোয়াডের লোক। সঙ্গে সায়ানাইড ক্যাপসুল আছে। গোলাঘরে আগুন লাগিয়ে দেবে। পুরো রুড়কি শহর উড়ে যাবে তাহলে। ওকে ধরতে গেলে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

রায়কাকু ঐ লোকটার আর এদিকে আসার চান্স নেই তো?

সাধারণত আসে না। হঠাৎ যদি এসে যায়......

তখন দেখা যাবে।

মিউ ওপরের ঘুলঘুলির দিকে মুখ করে আওয়াজ করলো। মনে হলো যেন একটা পাখি ডেকে উঠলো।

একটু পরেই একটা ছায়া এসে পড়লো ঘরে। মিউ আস্তে করে বললো, কিকি দ্যাখ তো ঘরে ঢুকতে পারিস কিনা।

পারবো...

ক্যাপ্টেন রায় ভীষণ অবাক হয়ে গেছেন। বুঝতে পারছেন না এরা কী করতে চাইছে? এদের আগে দেখেনওনি। ছেলেটির কাছ থেকে শুধু শুনেছেন সে ব্রিগেডিয়ার ব্যানার্জীর ভাগ্নে আর মেয়েটি ভাইঝি।

ততোক্ষণে কিকি এসে মিউয়ের কাঁধে বসেছে। যে কাগজটায় মিউ লিখেছিল সেটা পকেটে। মিউ-বাবুর হাত বাঁধা দেখে কিকি বললো, দড়ি কেটে দেবো?

না, তুই আমার পকেট থেকে ভাঁজ করা কাগজটা নিয়ে সোজা বাড়ি গিয়ে রাজাকে দিবি। বলবি, এক্ষুণি ব্যবস্থা করতে। আর জিমিকে বলবি কারখানার মধ্যে ঢুকে ঘাপটি মেরে থাকতে।

কিকি মিউয়ের পকেট থেকে চিঠিটা নিয়ে ঘুলঘুলির ওপর গিয়ে বসলো। তারপর তার ছোট্ট শরীরটা গলিয়ে দিয়ে বাইরে উড়ে গেলো।

ক্যাপ্টেন রায় এতোক্ষণ অবাক হয়ে দেখছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, পাখিটা তো দারুণ কথা বলে!

হ্যাঁ। কাকাতুয়া। ওর নাম কিকি। ও এখন কালকের ফায়ারিং-টেস্টিং বন্ধ করতে গেলো।

বাবু চাপা গলায় বললো, রায়কাকু, আমাদের লাইন অফ অ্যাকশান এবার ঠিক করে নিই।

ক্যাপ্টেন রায় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। উনি জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারচেয়েও বড় দুর্ভাবনা ছিল জলসেতু আর ক্যানটনমেন্ট ধ্বংসে করার জঙ্গি-পরিকল্পনা নিয়ে। অসহায়ের মতো তিনি প্রহর গুনছিলেন। কিন্তু এতোটুকুও আশার আলোর সন্ধান পাচ্ছিলেন না। এই ছেলে আর মেয়েটা আসার পর মনে হচ্ছে, বেঁচেও যেতে পারেন। আশ্চর্য। এইটুকু দুটো ছেলেমেয়ে নৃশংস জঙ্গিদের হাতে ধরা পড়েছে, কিন্তু একদম ভয় পায়নি। উল্টে কি করে ওদের কব্জা করবে তার প্ল্যান কষছে।

বাবু বললো, রায়কাকু আপনি শিওর তো খাবার দেবার সময় লোকটা একাই আসে?

এ ক'দিন তো তাই এসেছে।

আমাদের তৈরি থাকতে হবে দ্বিতীয় কারো জন্যে। তখন জিমিকে কাজে লাগাতে হবে।

মিউ বললো, জিমি কাছেই ঘাপটি মেরে থাকবে।

লোকটা খাবার দিয়ে আমাদের হাত খুলে দেবে। আমরা চটপট খেয়ে নিয়ে রায়কাকুর পায়ের চেনটা খুলে দেবো। লোকটা আমাদের হাত বেঁধে দিতে যেই আসবে অমনি আমরা আক্রমণ করবো। ওকে বেঁধে ফেলে মুখে কাপড় গুঁজে এই ঘরেই বন্ধ করে রাখবো। রায়কাকু, আপনাকে ঐ লোকটার প্রক্সি দিতে হবে কিন্তু।

সে কী!

তা নাহলে ওদের পুরো দলটাকে ধরা যাবে না।

ওরা কিন্তু দলে সাত আটজন আছে। আজ রাত্তিরে ওরা এখানে থাকবে। কাল জলসেতুতে রাখা টাইম বোমার সময় বেঁধে দিয়ে ওরা গাড়ি করে এখান থেকে পালাবে। গোলাঘরে এক্সপ্লোসিভ তো ওরা আগেই বদলে রেখেছে। ওরা জানে কাল সকালে টেস্টিং-এর সময় ভুল বোমা ফাটলেই পুরো ক্যানটনমেন্টটা উড়ে যাবে।

টেস্টিং কাল হচ্ছে না। কিকি এতোক্ষণে রাজাকে খবর পৌঁছে দিয়েছে।

একটু পরেই কিকি এসে বসলো ঘুলঘুলিতে। মিউ জিজ্ঞেস করলো, কি রে চিঠি দিয়ে এসেছিস?

হুঁ।

জিমি কোথায়?

কাছেই আছে।

তুই গাছে গিয়ে বস। লক্ষ্য রাখবি আর কেউ কারখানায় ঢোকে কিনা। ঢুকলেই খবর দিবি।

হাতবাঁধা দড়ি ছিঁড়বো না?

না। তুই যা।

কিকি উড়ে গেলো।

ক্যাপ্টেন রায় বললেন, তোমাদের ব্যাপার-স্যাপার কিছু বুঝছি না।

বেশি বোঝার দরকার নেই। তৈরি হোন লোকটাকে কব্জা করার জন্যে।

বাবু কথা শেষ করতেই মিউ বললো, বাবুদাদা তোমার সন্দেহই তাহলে ঠিক হলো।

গোলার ব্যাপারটা তো! কাঁচা রং দেখেই সন্দেহ হয়েছিলো।

কিসের কাঁচা রং?

ক্যাপ্টেন রায়ের প্রশ্ন শুনে বাবু হেসে তাঁর দিকে তাকিয়ে গোলাঘরে যা দেখেছিলো—সব বললো।

যশবীরের ছদ্মবেশী জঙ্গিটার কাজ। ওর আরো দুজন শাগরেদ আছে ওখানে।

তা আপনি তো যশবীরকে অনেকদিন ধরে চেনেন। একে দেখে সন্দেহ হয়নি?

না, একদম একরকম দেখতে। এক হাইট, এক ওয়েট। সব কিছুই একরকম। যশবীর ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়েছিলো। ঠিক দিনে এসে জয়েন করলো। সন্দেহের কোনো কারণই ছিলো না।

ও যে ছদ্মবেশী তা জানলেন কবে?

ধরে আনার পর।

ধরলো কি করে?

আমি ক্যানটনমেন্টের বাইরে একটা ভাড়া বাড়িতে থাকি। সেদিন অফিস যাবো বলে বেরিয়েছি যশবীর এসে ডাকলো। বিশেষ একটা কাজ, এক্ষুণি যেতে হবে। আমি ওর সঙ্গে এই কারখানার মধ্যে আসতেই চারদিক থেকে আমায় চেপে ধরলো তিনজন। যশবীরের হাতের পিস্তল আমার দিকে তাক করা। তারপর থেকেই তো এই ঘরে বন্দী।

॥ ছয় ॥

কথা বলতে বলতে বেলা যে অনেকটা গড়িয়ে গেছে ওরা বুঝতে পারেনি। হঠাৎ পায়ের শব্দ কানে আসতেই ওরা চুপ করে গেলো। শব্দটা এসে থামলো ওদের ঘরের সামনে। তারপর তালা আর শিকল খোলার শব্দ। দরজাটা খুলে গেলো। ওরা দেখলো, সেই লোকটা দুহাতে দুটো প্লেট নিয়ে ঘরে ঢুকছে। দুটো প্লেট দুজনের সামনে রেখে বাইরে বেরিয়ে আর একটা প্লেট নিয়ে এসে ক্যাপ্টেন রায়ের সামনে রেখে বললো, হাত খুলে দিচ্ছি। তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও।

লোকটা তিনজনের হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলো। বাবু তাড়াতাড়ি ক্যাপ্টেন রায়ের পায়ের শেকলটা খুলে দিয়ে খাবার থালা টেনে নিলো। চারটে করে মোটা রুটি আর খানিকটা ভাজি। গলা দিয়ে নামতে চায় না। তবু ওরা কোনোরকমে একটু একটু করে খেলো। উত্তেজনায় ওরা সেই মুহূর্তে টানটান। লোকটা এলেই আক্রমণ করবে।

দরজা খুলে লোকটা ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালো। পাতে রুটি পড়ে আছে দেখে কিছু বলতে যাচ্ছিলো। তার আগেই 'রায়কাকু রেডি' বলেই বাবু ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটার পা দুটো চেপে ধরলো। মিউ লাফিয়ে উঠে ওর মুখে ঘুষি মারতেই ক্যাপ্টেন রায় পেছন থেকে হাতদুটো চেপে ধরলেন। ব্যাপারটা কি হলো বোঝার আগেই লোকটা দেখলো তার হাত-পা বাঁধা হয়ে গেছে। বাবু বললো, রায়কাকু আমরা বাইরে যাচ্ছি। আপনি চট করে ওর পোশাকটা পরে নিয়ে ওকে আপনারটা পরিয়ে দিন।

ওরা বাইরে এসে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল।

এ কী তোমরা বাইরে?

একটা তাগড়া চেহারার লোক ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। বাবু বললো, মুখ ধুচ্ছি।

মুখ ধোয়াচ্ছি দাঁড়াও...

লোকটা এগিয়ে এসে ওদের সামনে দাঁড়াতেই বাবু আচমকা ব্রুস লির কায়দায় পা তুলে দুম করে ওর পেটে মারলো। মিউ ডান হাতে চড় কষালো ঘাড়ে। তবে রে... বলে লোকটা পকেট থেকে পিস্তল বার করতেই কোথায় ঘাপটি মেরে বসেছিলো জিমি—বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে পিস্তল-সুদ্ধু হাতটা কামড়ে ধরলো। পিস্তলটা হাত থেকে মাটিতে খসে পড়লো। কিকি এসে ওর মুখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠুকরোতে শুরু করে দিলো।

যন্ত্রণায়, আতঙ্কে লোকটা চিৎকার করে উঠলো। ক্যাপ্টেন রায় তাড়াতাড়ি বাইরে এসে আর একজনকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। তারপর ঘরের মধ্যে ঢুকে চেন এনে ওর হাত পা লক করে দিলেন। লোকটাকে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া হলো। দুজনের মুখে ভালো করে কাপড় গুঁজে দিয়ে দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলেন। জিমি পাশে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ছে। কিকি এসে বসেছে মিউয়ের কাঁধে। মিউ বাবুর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, এবার?

সুড়ঙ্গটা খুঁজে বের করে তারগুলো কেটে দিতে হবে।

মিউ বললো, সুড়ঙ্গটা সম্ভবত ঐ দিকে। ঐ যে ঘরটা—ওখান দিয়ে আমায় এনেছিল।

তোর চোখ বাঁধেনি?

না।

গুড। চল তাহলে।

কিকি ঐ গাছের ডালে বসে পাহারা দে। কাউকে আসতে দেখলেই ডেকে উঠবি।

ক্যাপ্টেন রায়ের এতোক্ষণে ওদের ওপর আস্থা জেগেছে। যেভাবে এইটুকু দুটো বাচ্চা ছেলে-মেয়ে দুজন জঙ্গির সঙ্গে লড়ে তাদের কাবু করে ফেললো নিজের চোখে না দেখলে বোধহয় বিশ্বাস করতেন না ক্যাপ্টেন রায়।

বাবু আর মিউ ততোক্ষণে অনেকটা এগিয়ে গেছে। জিমিও চলেছে ওদের সঙ্গে। ক্যাপ্টেন রায় অবাক হয়ে দেখলেন, কাকাতুয়াটা গিয়ে গাছের ডালে বসে চারদিকটা লক্ষ্য রাখছে। সুড়ঙ্গটা কোথায় তিনি জানতেন না। আজই প্রথম বাবুর কাছে শুনেছেন। ওরা ঘরে ঢুকে পেছন-দিককার দরজা খুলতেই দেখলো নিচের দিকে একটা সিঁড়ি।

জিমি নিচে নাম...

মিউ-এর কথা শুনে জিমি তরতর করে নামতে শুরু করলো। পেছনে ওরা। ভেতরটা অন্ধকার। ওরা বেশি দূর নামলো না। তবে তারগুলোর হদিস পেলো। বাবুর কাছে ছুরি ছিলো। চটপট সবকটা তার কেটে দিলো। ক্যাপ্টেন রায় বললেন, মুখগুলো মাটিতে পুঁতে দাও।

কাঁচা মাটি। কোনো অসুবিধে হলো না। তারের মুখগুলো ওরা মাটিতে পুঁতে দিয়ে ঘরে এসে ঢুকতেই কিকি ডেকে উঠলো।

মিউ বললো, সর্বনাশ কেউ আসছে।

বাবু ক্যাপ্টেন রায়ের দিকে ফিরে বললো, আপনি যে বললেন দিনের বেলায় একটা লোকই থাকে।

ঘরের মধ্যে থেকে দরজা ফাঁক করে ওরা দেখলো লোকটা প্রথমে রান্নাঘরের

দিকে গেলো। সেখানে কাউকে না দেখে বন্দী-ঘরটার দিকে উঁকি মেরে ওদের ঘরের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। ক্যাপ্টেন রায় বললেন, সরে দাঁড়াও। লোকটা ঘরে ঢুকলেই আচমকা আক্রমণ করে ওকে কাবু করে ফেলবো।

ওরা দরজার নিককার দেয়ালে গা লাগিয়ে দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে।

আরে তোরা এখানে কি করছিস...

লোকটা ঘরে ঢুকতেই ক্যাপ্টেন রায় দুম করে ঘুষি মারলেন। বাবু আর মিউ একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুহূর্তের মধ্যে লোকটাকে কাবু করে ফেললো। বাবু লোকটার পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে নিলো। মিউ ছুটে গিয়ে দড়ি আনলো। লোকটাকে পিছমোড়া করে বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে সুড়ঙ্গটার মধ্যে ফেলে রাখা হলো।

ক্যাপ্টেন রায় বললেন, এ তো মহা মুশকিল দেখছি! ওরা কজন কিছু জানি না। এইভাবে একজনের পর একজন এলে তো পারা যাবে না। তার চেয়ে চলো গোলাঘরে গিয়ে যশবীরকে অ্যারেস্ট করি।

হ্যাঁ সঙ্গে সঙ্গে সে গোলাঘরে আগুন লাগিয়ে সায়ানাইড ক্যাপসুল মুখে পুরুক।

বাবুর কথা শুনে চুপ করে গেলেন ক্যাপ্টেন রায়। কথাটা মিথ্যে নয়। এরা প্রাণের মায়া করে না। মানুষ খুন করতে ইতস্তত করে না। কিন্তু এইভাবে দুটি বাচ্চা ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিয়ে কতোজন জঙ্গির মোকবিলা করা যাবে! নেহাত ওরা বিপদের কোনো আশঙ্কা করছে না তাই। ওরা তৈরি হয়ে এলে ওদের মোকাবিলা করা মোটেই সোজা নয়, কিন্তু উপায়ও নেই।

ছদ্মবেশী যশবীর কখন ফেরে?

দুটোয় ছুটি। দুটো পনেরো নাগাদ...

তাহলে আমাদের হাতে খানিকটা সময় আছে। ওরা কোন ঘরটায় থাকে একবার দেখা দরকার।

কেন?

যদি কাগজ-পত্তর কিছু পাওয়া যায়।

ঠিক বলেছো। ক্যাপ্টেন রায় লাফিয়ে উঠলেন।

একটু খোঁজাখুঁজির পর কারখানার অফিসঘরে গিয়ে ওরা যা চাইছিলো তাই পেয়ে গেলো। পর পর চারটে ক্যাম্প খাট। বিছানা গোটানো।

তার মানে এখানে চারজন থাকে। বাবু বললো।

তাদের মধ্যে তিনজনকে আমরা ধরে ফেলেছি। রইলো বাকি এক।

তাকেও এক্ষুনি ধরবো।

তালা দেওয়া একটা বড় বাক্স ছিলো পাশে। তালা ভেঙে বাক্সটা খুলতেই বেরিয়ে পড়লো বেশ কিছু কাগজপত্তর। দুটো স্টেনগান। পিস্তল, টোটা। আর ওয়াকিটকির মতো একটা কি! ক্যাপ্টেন রায় সেটা তুলে নিয়ে সুইচ অন করলেন। কয়েকবার পিপ্ পিপ্ পিপ্ করার পর গলা ভেসে এলো...হ্যালো জি থ্রি...হ্যালো জি থ্রি...দিস ইজ ওয়ান...দিস ইজ ওয়ান...এনি ম্যাসেজ...এনি ম্যাসেজ...ওভার...

ক্যাপ্টেন রায় বলতে লাগলেন, হ্যালো ওয়ান, হ্যালো ওয়ান...দিস ইজ জি থ্রি...দিস ইজ জি থ্রি...ওভার...রেডি ফর দ্য ফাইনাল অ্যাসাল্ট...অ্যাট এইট পাস্ট টেন এ এম...এইট পাস্ট টেন এ এম...ওভার ...এনি ম্যাসেজ।

প্রসিড টুয়ার্ডস সাহারানপুর অ্যাট এইট এ এম...অ্যাট এইট এ এম...রিপোর্ট টু জি ওয়ান দেয়ার...ওভার...

ক্যাপ্টেন রায় সুইচ অফ করে দিয়ে বললেন, ভেবে দ্যাখো এই জঙ্গিরা আমাদের সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে এখানে যা কাগজপত্তর পাওয়া গেলো তাতে বেশ কিছু জঙ্গি ধরা পড়বে। আমরা এই পুরো বাক্সটাই নিয়ে যাবো।

ঠিক তখনই কারখানার গেটের বাইরে থেকে মোটর সাইকেলের আওয়াজ ভেসে এলো। ক্যাপ্টেন রায় বললেন, যশবীর এলো। আমরা এখানেই ঘাপটি মেরে থাকি। ও এলে একসঙ্গে অ্যাটাক করবো।

বাবু জিজ্ঞেস করলো, জিমি কোথায়?

কাছেই কোথাও আছে।

ওরা ঘাপটি মেরে বসলো।

জুতোর শব্দ এগিয়ে আসছে। বাবুর মনে হলো, চলার শব্দ খুব একটা স্বাভাবিক নয়। খুব সতর্ক। বাবু আর মিউ-এর চোখে চোখে কথা হয়ে গেলো। ওরা বিপদের গন্ধ পেয়েছে। কিন্তু ক্যাপ্টেন রায়কে জানাবার আগেই আচমকা শব্দ করে দরজা খুলে গেলো। পিস্তল উঁচিয়ে ফৌজি অফিসার ঘরে ঢুকেই চিৎকার করে উঠলো, হ্যান্ডস আপ।

একজন নয়। দু জন। দুজনেরই হাতে উদ্যত পিস্তল।

ওরা হাত তুলে দাঁড়ালো। হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো অফিসারটা। ক্যাপ্টেন সাব, বাচ্চা দুটোও আছে দেখছি...এদের বেঁধে ফেল, কুইক।

দড়ি চাই সাব।

দাঁড়া, এনে দিচ্ছি। পিস্তল উঁচিয়ে থাক। বেগড়বাই করলেই গুলি চালাবি।

কথা বলতে বলতে বাইরে বেরিয়ে গেলো লোকটা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উঃ...কাতর ধ্বনি ভেসে এলো। সেইসঙ্গে জিমির গজরানি। এইরকম একটি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো বাবু। অন্য লোকটার মুহূর্তের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর। ক্যাপ্টেন রায় এসে চেপে ধরলেন তাকে। মিউ চিৎকার করে বললো, জিমি, ছাড়বি না।

মিউ ছুটে গিয়ে ঘরের মধ্যের আর বাইরের পিস্তল দুটো কুড়িয়ে নিলো। জিমির গজরানি শুনে আরও তিন-চারটি বিশাল চেহারার কুকুর এসে ঘিরে ধরেছে লোকটাকে। জিমি এখনো হাতটা কামড়ে ধরে আছে। মিউদের কাছে সব সময় দড়ি-টড়ি থাকে। দড়ি দিয়ে আগে ঘরের মধ্যের লোকটাকে পিছমোড়া করে বাঁধা হলো। তারপর তিনজন বেরিয়ে বাইরে এলো। লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন রায় বললেন, যশবীর, তোমার খেল খতম।

ইতনা আসান নেহি রায় সাহাব। কাল আপ্‌কা ক্যানটনমেন্ট বরবাদ হো যায়গা...য়ো ব্রিজ ভি। হামারা আদমি গেটকা বাহার মজুত হ্যায়। বাহার যায়গা তো গোলি মার দেগা...

হেসে উঠলেন ক্যাপ্টেন রায়। বাবু আর মিউ চটপট বেঁধে ফেললো যশবীরকে। দুজনকেই মুখে কাপড় গুঁজে টেনে নিয়ে গিয়ে সুড়ঙ্গর মধ্যে ফেলে রাখা হলো।

ক্যাপ্টেন রায় বললেন, পাঁচজন ধরা পড়লো আরও ক'জন আছে কে জানে!

বাবু বললো, সত্যিই কি গেটের বাইরে ওদের লোক পাহারা দিচ্ছে?

দাঁড়াও, এক্ষুণি খোঁজ নিচ্ছি। মিউ মুখ দিয়ে একটা শব্দ করতেই কিকি উড়ে এসে

ওর কাঁধে বসলো। মিউ ওকে কিছু বোঝালো—কিকি উড়ে বাইরে চলে গিয়ে পুরো কারখানাটা একবার চক্কর দিয়ে এসে মিউ-এর কাঁধে বসে বললো, জিমির বন্ধুরা ছাড়া আর কেউ নেই।

বেলা গড়িয়ে গেছে। ওরা অফিসবাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলো। মিউ নিচে নেমে জিমিকে ডাকলো। কিকি ওর কাঁধে। জিমিকে আদর করে মিউ ওকে বুঝিয়ে দিলো এবার ওকে কী করতে হবে। জিমি খুশিতে লেজ নাড়তে লাগলো। তারপর ঘেউ ঘেউ করে ডেকে ওর গোপন পথ দিয়ে বেরিয়ে গেলো। ওর পেছনে বেরিয়ে গেলো আরও তিনটি বিশাল চেহারার কুকুর। কুকুরগুলো যে কারখানার মধ্যে ছিলো তা ওরা জানতো না।

বাবু জিজ্ঞেস করলো, জিমিকে কি বললি?

সব কুকুর এনে কারখানার পাশে ওৎ পেতে বসে থাকতে বললাম। এদের দলে আরও কতোজন আছে কে জানে!

ক্যাপ্টেন রায় বললেন, যা যা এখন পর্যন্ত ঘটেছে তার একটা রিপোর্ট ব্রিগেডিয়ার সাহেবকে দেওয়ার দরকার।

মিউ তাকালো বাবুর দিকে। বাবু বললো, রাত্তিরে আমরা এখানে থাকবো। ভোরবেলায় গাড়ি আসবে ওদের পিক আপ করতে। গাড়িতে যে ক'জন থাকে তাদের সবাইকে ধরতে হবে।

ওদের কাছে অস্ত্র থাকবে। এ কথাটা ভুলে যেও না।

সেইজন্যেই তো ভাবছি।

মিউ বললো, একটা চিঠি লিখে মেজদাকে সব জানানো যাক। ভোরবেলায় ওদের গাড়ি আসার আগেই যাতে সেনা-বাহিনীর লোক ফাঁদ পেতে রাখে। গাড়ি এলেই যেন ধরা পড়ে যায়। তাতে যদি লড়াই হয় হোক। গুলি চলে চলুক।

ক্যাপ্টেন রায় বললেন, সেইটাই বুদ্ধিমানের কাজ। ওদের কাছে এল এম জি (লাইট মেশিনগান) থাকতে পারে। গুলিতে ঝাঁজরা করে দেবে। ওদের সঙ্গে কিছুতেই পেরে উঠবো না।

মিউ চিঠি লিখে কিকিকে দিলো। কিকি বললো, আমিও রাত্তিরে এখানে থাকবো।

মিউ হেসে মাথা নাড়লো।

॥ সাত ॥

সন্ধ্যে গড়িয়ে গেছে। কিকি মেজদাকে খবর দিয়ে ফিরে এসেছে। ওরা রান্নাঘরে গিয়ে কিছু রুটি-সব্জি আর ফল পেয়েছিলো। তাই খেয়েছে। কিকিও ফল খেয়েছে। ওরা বার কয়েক দরজা খুলে বন্দী দুজনকে দেখেছে। উঁকি মেরে দেখেছে সুড়ঙ্গ। হঠাৎ মিউ-এর কি মনে হলো জিমিকে ডাকলো।

জিমি এসে মিউ-এর পায়ে মাথা ঘষতে ঘষতে লেজ নাড়তে শুরু করেছে। অনেক কাজ করেছে ও। রুড়কির প্রায় সব কুকুরকে এনে হাজির করেছে কারখানার কাছে। মিউ জিমিকে আদর করতে করতে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে বুঝিয়ে দিলো তার নতুন দায়িত্ব। জিমি লাফিয়ে উঠে বেরিয়ে গেলো। একটু পরে দেখা গেলো ছটা কুকুর এসে বন্ধ দরজা দুটো আর সুড়ঙ্গর মুখের কাছে বসে পড়লো।

মিউ বললো, ওরা ওখানে পাহারা দেবে। আর কটা থাকবে জলসেতুর তলায় সুড়ঙ্গর অন্য মুখে।

বাবু হেসে বললো, এতোক্ষণে নিশ্চিন্ত

হওয়া গেলো।

ক্যাপ্টেন রায় বললেন, শেষ রাতের দিকে ওদের আর একটা দল গাড়ি নিয়ে আসবে। বিস্ফোরণের আগেই ওরা শহর ছেড়ে পালাবে। কিকি ঠিক খবর নিয়ে এসেছে তো? তা নাহলে কিন্তু বাকী জঙ্গিগুলোকে ধরা যাবে না।

মিউ হাসলো, সে ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। এ সব ব্যাপারে কিকির ভুল হয় না।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শহরটা চুপচাপ হয়ে গেলো। এখানে বেশিক্ষণ বাসটাস চলে না। সিনেমার নাইট শো শুরু হয় রাত সাতটায়। ফলে পুরো শহরটাই ঘুমিয়ে পড়ে তাড়াতাড়ি। কখনো-সখনো একটা আধটা গাড়ি দেরাদুন, মুসৌরীর দিক থেকে আসে কিংবা যায়।

বাইরে ওদের খুব শীত করছিলো। কিকিকে ডেকে নিয়ে ওরা একটা ঘরে গিয়ে বসলো। সারা রাত জেগে কাটাতে হবে। অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। চোখ বুজে বসে থাকতে থাকতে ওরা ঘুমিয়ে পড়েছিল। সারাদিন ধকল তো কম যায়নি। হঠাৎ কুকুরের প্রচণ্ড ডাকাডাকিতে ওদের ঘুম ভেঙে গেলো। আকাশে তখন আধখানা চাঁদ। তার আবছা আলোয় অস্পষ্টভাবে দূরের গাছ, বাড়ি দেখা যাচ্ছে। কুকুরের ডাক আসছে জলসেতুর তলা থেকে। ওরা লাফিয়ে উঠে ছুটলো। কারখানার পেছনের শর্টকাট পথটা ছিলো সেখান দিয়েই গেলো। দূর থেকে দেখলো কুড়ি-পঁচিশটা কুকুর ঘিরে দাঁড়িয়ে ঘেউ ঘেউ করছে। ওরা যেতেই পথ ছেড়ে দিয়ে লেজ নাড়তে লাগলো। ওরা অবাক হয়ে দেখলো হাত-বাঁধা তিনটে লোককে ওরা ঘিরে ধরে আছে।

ক্যাপ্টেন রায় বললেন, এতোটা পথ ওরা ক্রল করে এসেছে। কুকুরগুলো না থাকলে এতোক্ষণে তিনজনই পালিয়ে যেতো।

হঠাৎ কথা থামিয়ে ক্যাপ্টেন রায় কিছু যেন দেখলেন। তারপর চিৎকার করে উঠলেন, গার্ডস...

ওরা অবাক হয়ে দেখলো মাটি ফুঁড়ে একদল সৈন্য যেন উঠে দাঁড়ালো। তারপর তীরবেগে ছুটে এলো ওদের দিকে।

ক্যাপ্টেন রায়কে অন্য পোশাকে হলেও

'রেডি' বলেই বাবু ঝাঁপিয়ে পড়ে

ওদের চিনতে কোনো অসুবিধে হয়নি। স্যালুট করে দাঁড়ালো। ক্যাপ্টেন রায় বললেন, এই তিনজনকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাও।

ব্রিগেডিয়ার সাব গাড়ি মে হ্যায়...

ওদের নিয়ে গাড়ির কাছে এলেন সেই অফিসারটি। ওদের দেখে অবাক হয়ে ব্রিগেডিয়ার ব্যানার্জি বললেন, তোরা...

তিনটে জঙ্গি পালাবার চেষ্টা করছিলো। কুকুরগুলো আটকেছে।

সে কী! কুকুরগুলো আটকেছে! তার মানে?

জিমি রুড়কির সব কুকুরদের এনে চারদিকটা পাহারা দিচ্ছে না!

মিউএর ব্যবস্থা নিশ্চয়ই।

হ্যাঁ, আমারও। কিকি গম্ভীর গলায় বলে জিপের মধ্যে গিয়ে বসলো।

সেই মুহূর্তে ভেসে এলো গাড়ির আওয়াজ। দূর থেকে আসছে।

তোরা জিপে উঠে পড়। ক্যাপ্টেন রায় আপনিও উঠুন। ওরা সশস্ত্র। গুলি চলতে পারে। ব্রিগেডিয়ার ব্যানার্জি বললেন।

গাছের আড়ালে ডাল-পালা দিয়ে ঢাকা ছিলো গাড়িটা। এমনিতেই বোঝার উপায় নেই। অন্ধকারে তো নয়ই।

কারখানার গেটের সামনেটা ফাঁকা। কুকুরগুলো এদিকে ওদিকে ঘাপটি মেরে আছে। গাড়িটা গিয়ে গেটের সামনে দাঁড়ালো। চারটে লোক গাড়ি থেকে নেমে গেটের দিকে এগিয়ে যেতেই তিরিশ-চল্লিশটা কুকুর ঝাঁপিয়ে পড়লো ওদের ওপর। চারজনের হাতেই স্টেনগান ছিলো। কিন্তু সেগুলো ব্যবহার করার সুযোগই ওরা পেলো না। তার আগেই একদল জওয়ান ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের কব্জা করে ফেললো।

চারজনকে বেঁধে গাড়িতে তোলা হলো। তারপর কারখানার মধ্যে থেকে বের করে আনা হলো বাকি চারজনকে। একটা গুলিও চালাতে হলো না, ধরা পড়ে গেলো পুরো জঙ্গিদলটাই।

ওদের নিয়ে ব্রিগেডিয়ার ব্যানার্জির গাড়ি যখন ক্যান্টনমেন্টে ফিরলো তখন ভোরের আলো সবে ফুটেছে। মামণি, বুয়া, মোমা আর রাজা এসে দাঁড়িয়েছে বাইরে। গাড়ি থামতেই কিকি উড়ে গিয়ে বুয়ার কাঁধে বসে বললো, উঃ! বড্ড ঘুম পেয়েছে।

গাড়ির পেছনে ছুটতে ছুটতে জিমিও যে এসে গেছে তা কেউ জানতো না। ও এগিয়ে এসে লেজ নাড়তে লাগলো।

মেজদা বললেন, জিমির দলবলকে আজকে ভাত আর মাংস খাওয়ানো হবে। লঙ্গরে খবর দাও।

ক্যাপ্টেন রায়ের দিকে ফিরে ব্রিগেডিয়ার সাহেব বললেন, আপনি বাড়ি ফিরে যান। ওঁরা খুব উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন। আপনি ভালো আছেন, আজ আসবেন সে খবর অবশ্য কাল রাত্তিরে ওঁদের দিয়েছি।

বাবু, মিউ, মোমা, রাজা, বুয়া, কিকি আর জিমিকে নিয়ে কদিন খুব হৈচৈ চললো। রুড়কির মানুষ দলে দলে ওদের দেখতে আসছে। খবরের কাগজের রিপোর্টাররা আসছেন। সারা ভারতের কাগজে কাগজে ওদের খবর, ওদের সাক্ষাৎকার বেরুলো। স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রক থেকে ঘোষণা করা হলো, সেবার ২৬ জানুয়ারির প্যারেডের সময় ওদের বিশেষভাবে পুরস্কৃত করবেন রাষ্ট্রপতি স্বয়ং।

এতো হৈচৈ-এর মধ্যে ওদের ফিরে আসার দিন যে এসে গেছে তা কারো খেয়ালই ছিলো না। যখন খেয়াল হলো তখন সকলের মন খারাপ। ওদেরও মন খারাপ—মুসৌরীটাই যে দেখা হলো না!

ছবি: বিজন কর্মকার

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়
জন্ম - ১৯৪০
মৃত্যু - ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০১৫
ছদ্মনাম ঃ সোমনাথ

বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। যুগান্তর পত্রিকার প্রাক্তন ক্রীড়া সম্পাদক শান্তিপ্রিয়বাবু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন শুকতারা ও নবকল্লোল পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে। খেলা নিয়ে বারোটি জনপ্রিয় বই লেখার পাশাপাশি তিনি লিখেছেন অন্য বিষয় নিয়ে দশটির বেশি উপন্যাস। এর মধ্যে জনপ্রিয়তা পায় ‘তিন কন্যার কাহিনী’, ‘দেবী’, ‘কলঙ্ক’। তাঁর লেখা ২১ টি রহস্য সিরিজও বেশ জনপ্রিয়তা পায়। সোমনাথ ছদ্মনামে তিনি লেখেন অনেক ভ্রমণ কাহিনীও। ছোটদের জন্য তিনি রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজ রচনা করেন। ষাটের দশকে শুকতারা, বসুমতী পত্রিকায় লেখালেখি শুরু তাঁর। পরে যোগ দেন যুগান্তরে। মাঝে এরিয়ানের হয়ে ক্রিকেটও খেলেন তিনি। ভদ্রতা ও সৌজন্যবোধের জন্য খেলার মহলে সুপরিচিত।
তাঁর বিখ্যাত রচনা গুলির মধ্যে আছে ক্রিকেট খেলার আইন কানুন, ফুটবল খেলার আইন কানুন, ব্যাটের রাজা গাভাসকর, বলের রাজা পেলে, ফ্রি-কিক, ক্রিকেটের পাঁচ অধিনায়ক, ক্লাবের নাম ইস্টবেঙ্গল, ক্লাবের নাম মোহনবাগান, তীরন্দাজ, সোনার ছেলে মারাদোনা, সৌরভ, সুরঙ্গ রহস্য ইত্যাদি।
শিশু সাহিত্যের জন্য তিনি বিদ্যাসাগর শিশু সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হন।
১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০১৫ সালে কলকাতায় পঁচাত্তর বছর বয়সে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন শান্তিপ্রিয়বাবু